

Vol. 34 | No. 1 | 1990

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

মৈমনসিংহ গীতিকা'র জনজীবন

Volume	34
Issue	1
Year	1990
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	ফাতেমা কাওসার
Published online	February 1, 1991
DOI	10.62328/sp.v34i1.8
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v34i1.8
Pages	161-198
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

'মৈমনসিংহ গীতিকা'র জনজীবন

ফাতেমা কাওসার

বাংলা সাহিত্যে এ যাবৎ সংগৃহীত গীতিকার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে '*মৈমনসিংহ-গীতিকা।*' চন্দ্রকুমর দে কর্তৃক সংগৃহীত মৈমনসিংহ অঞ্চলের ১০টি পালাগান ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত হয়ে '*মৈমনসিংহ গীতিকা*' নামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে। '১৯২৩ সালে প্রথম আলোচ্য গাথাগুলির ইংরেজী অনুবাদ **Eastern Bengal Ballads—Mymensingh** নামে একত্রে প্রকাশিত হয় এবং তারপর ঐ একই বছরে *মৈমনসিংহ গীতিকা* নামে মূল গাথাগুলির সংগ্রহ প্রকাশিত হয়।'[১] *মৈমনসিংহ গীতিকা-য়* সংকলিত পালাগুলো ময়মনসিংহ অঞ্চলে রচিত, প্রচলিত এবং এ অঞ্চল থেকে সংগৃহীত বলে সংকলনটির নাম দেয়া হয়েছে '*মৈমনসিংহ গীতিকা।*'

মৈমনসিংহ গীতিকা-র কোন কোন গাথা বা পালা একটু অন্যরকমভাবে ময়মনসিংহের বাইরে অন্যান্য অঞ্চলেও প্রচলিত দেখা যায়। বয়াতী কিংবা গায়েনদের কাহিনী চুরি করার স্বভাব রয়েছে— এ সমস্ত কারণে পালাগুলো যথার্থই ময়মনসিংহ অঞ্চলের কী না তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে।[২] কিন্তু উল্লিখিত সম্ভাবনার কারণ থাকলেও *মৈমনসিংহ গীতিকা-র* পালাগুলো যে ময়মনসিংহ অঞ্চলেরই জনজীবন ও ভাষার কাব্যরূপ, তা সন্দেহাতীত। কারণ এ সমস্ত পালায় বর্ণিত স্থান- কাল- পাত্র তথা ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিবেশের যে পরিচয় বিধৃত, তাতে ময়মনসিংহ অঞ্চলের প্রত্যক্ষ ছাপ সুস্পষ্ট। পালাগুলোর কাহিনী ও ঘটনার বর্ণনায় গৃহীত চরিত্র, চরিত্রের নিজের মুখে এবং কবির বর্ণনায় আঞ্চলিক ভাষা ও শব্দের উচ্চারণ ও প্রয়োগ—এসব থেকেও প্রমাণিত হয়, পালাগুলো ময়মনসিংহ অঞ্চলেরই কবি কর্তৃক রচিত, সে অঞ্চলের গায়েন

কর্তৃক সাধারণ মানুষের উপভোগের জন্য গীত। সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে পূর্ব ময়মনসিংহের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এ পালাগুলো সংগ্রহ করে দীনেশচন্দ্র সেনকে পাঠিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে ময়মনসিংহ অঞ্চলের অধিবাসী এবং চন্দ্রকুমার দে'র প্রতিবেশী রওশন ইজদানীর বক্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে :

> ময়মনসিংহ-গীতিকায় সংগৃহীত পালাগান সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কোন ভুল ধারণা নেই। আমারই প্রতিবেশী চন্দ্রকুমার দে যেখানে যেমনটি শুনেছিলেন, কাহিনী ঠিক তেমনটিই সংগ্রহ করেছিলেন। তবে দু'একটি পালার নামকরণে অনধিকার হাত দেওয়া হয়েছে; একথা চন্দ্রকুমার দে জীবদ্দশায় তাঁর বাড়িতে বসেই স্পষ্ট স্বীকার করেছিলেন; যেমনঃ ক্রবাদিয়ানীর পালা'র মহুয়া নামকরণ, অথবা ক্রউনার বাইদ্যা'কে ক্রহমরা বেদে' বলে উল্লেখ, ক্রআলালের দুলাল' পালার দেওয়ানা মদিনা নামকরণ ইত্যাদি। [৩]

বস্তুত *মৈমনসিংহ গীতিকা*-র বিভিন্ন পালায় চিত্রিত জনজীবন, তাদের প্রাত্যহিক জীবনাচরণ এবং উচ্চারিত ভাষা-কাঠামোটি যেভাবে শিল্পরূপ পেয়েছে, তাতে এগুলো ময়মনসিংহ অঞ্চলেরই জনজীবন ও ভাষার প্রতিনিধিত্ব করে। তাই একথা আজ স্বীকৃত যে, 'স্থানীয় প্রকৃতি এবং জীবনই ময়মনসিংহ গীতিকার প্রধান উপজীব্য এবং ব্রহ্মপুত্র নদীর পূর্বাঞ্চলই ময়মনসিংহ গীতিকার ভূগোল।' [৪]

ব্রহ্মপুত্র ময়মনসিংহ জেলার জনজীবন ও ঐতিহ্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ব্রহ্মপুত্রকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে ময়মনসিংহ অঞ্চলের বিচিত্র জনগোষ্ঠী ও তাদের সংস্কৃতি। 'উত্তরে গারো পাহাড়, দক্ষিণে মধুপুর,—ভাওয়ালের বনাঞ্চল, পশ্চিমে যমুনা নদী আর পূর্বে সুরমা-ধনু-মেঘনার প্রবাহসীমার মধ্যে রৌদ্র ছায়ায় লীলায়িত এই যে বিচিত্র ভূভাগ, ময়মনসিংহ জেলা যার নাম'[৫]—তাকে উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব কোণ পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদ সমান দুইভাগে ভাগ করেছে। ব্রহ্মপুত্রের পূর্বাংশ অর্থাৎ সদর উত্তর নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ এবং পশ্চিমাংশ সদর দক্ষিণ জামালপুর-টাঙ্গাইল—এই অংশ দুটি শুধু প্রাকৃতিকভাবেই বিভক্ত নয় বরং দুটি ভিন্ন সমাজ ও সংস্কৃতিতেও বিভক্ত। ব্রহ্মপুত্রের পূর্বপার অর্থাৎ নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ ময়মনসিংহের (তৎকালীন বৃহত্তর অবিভক্ত ময়মনসিংহের কথাই এখানে বলা হচ্ছে) এই পূর্বাঞ্চলই *মৈমনসিংহ গীতিকা*-র লীলাভূমি। 'বস্তুতঃ ব্রহ্মপুত্রই এ জেলার ইতিহাসের, বন্ধনসূত্র; এর স্রোত- বাহিত পলি দিয়ে

গড়ে উঠেছে এ জেলার ভূমি সংস্থান আর এরই তীরে তীরে গড়ে উঠেছে ভাগ্যান্বেষী, শরণার্থী ও আদিবাসীদের মিশ্রিত জনসমাজ।'[৬] *মৈমনসিংহ গীতিকা-য়* এই মিশ্রিত জনসমাজের ও জনজীবনের ছবি ভাষারূপ পেয়েছে। যাযাবর শ্রেণীর ভ্রাম্যমাণ জীবন থেকে শুরু করে কৃষিভিত্তিক স্থায়ী জীবনের বিস্তৃত পরিধিতে *মৈমনসিংহ গীতিকা-র* পাত্র-পাত্রীর জীবনকাহিনী বিধৃত। এদের কেউ সাপুড়ে, কেউ শিকারী, কেউ মৎস্যজীবী, কেউ মাঝি-মাল্লা, কেউ ব্যবসায়ী, কেউ কৃষিজীবী। এদেরই জীবন গাথা *মৈমনসিংহ গীতিকা।* ময়মনসিংহের ভৌগোলিক অবস্থান, পরিবেশ ও প্রকৃতির প্রভাবে গড়ে উঠেছে এদের চারিত্রিক সত্তা।

'হাওড়, জঙ্গল, মইষের শিং—এই তিনে মৈমনসিং'-ময়মনসিংহে প্রচলিত এই অল্প বাক্যটিতেই ময়মনসিংহ অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিচয় সুস্পষ্ট। বিভিন্ন নদ-নদী প্লাবিত বিরাট বিস্তৃত নিম্নভূমি ভাটি অঞ্চল ও তার প্রকৃতি এ অঞ্চলের মানুষকে করেছে উদার, সহজ-সরল ও হৃদয়বান। অন্যদিকে গারো পাহাড়, পাহাড় সংলগ্ন টিলা, গভীর অরণ্যে ঘেরা সমতল ভূমি, শাল গজারির বন, বনাঞ্চলে হাতি বাঘ মহিষ ইত্যাদি বন্যজন্তুর বিচরণ এদেরকে করেছে সাহসী সংগ্রামী। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য এদের জীবনে ও চরিত্রেও বৈচিত্র্যের সমাহার এনেছে। সমগ্র *মৈমনসিংহ গীতিকা-য়* উক্ত অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক পরিবেশের এক নিটোল চিত্র চোখের সামনে ভেসে ওঠে। দীনেশচন্দ্র সেনের ভাষায়, 'পূর্ব্ব-মৈমনসিংহের ঝিল ও তড়াগ, সর্প ব্যাঘ্র সংকুল অরণ্যভূমি, কুড়াপাখীর গুরুগম্ভীর শব্দে নিনাদিত আকাশ, 'বারদুয়ারী ঘর' ও সানবাঁধা পুকুর ঘাট, স্বর্ণপ্রসূ শালীধান্যক্ষেত্র ও সুরভিপূর্ণ কেয়াবন এই গাথাগুলির কল্যাণে আমাদের একান্ত পরিচিত ও প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।'[৭] প্রাকৃতিক দিক থেকে বিচ্ছিন্ন একটি স্বয়ম্ভর গ্রামীণ সমাজের বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত ছিল এ অঞ্চল। সাংস্কৃতিক ভাবেসমৃদ্ধ এ অঞ্চল অন্যান্য গ্রামীণ জীবন থেকে ছিল স্বতন্ত্র। পূর্ব মৈমনসিংহের গ্রামীণ জীবন বাস্তব রসমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছে *মৈমনসিংহ গীতিকা-র* পালাগুলোতে।

১

আমরা জানি সমাজে ঘটে যাওয়া কোন সত্য ঘটনা, জনশ্রুতিমূলক কোন কাহিনী বা কিংবদন্তীকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে গাথা। *মৈমনসিংহ গীতিকা-র* বিভিন্ন পালা এভাবেই রচিত। লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখার মত পালাগুলোও লোকমুখে রচিত

ও প্রচলিত। তাই পালাগুলোর রচনাকাল সম্পর্কে একেবারে সুনির্দিষ্ট করে কিছু বলার অবকাশ নেই। বরং এ সম্পর্কে মতানৈক্য থাকাটা স্বাভাবিক। কাহিনীর পরিণত রূপ, সম্পাদিত গ্রন্থের বিভিন্ন পালায় অনেক ক্ষেত্রে আধুনিক শব্দের প্রয়োগ ও আধুনিক উচ্চারণের ব্যবহার ইত্যাদি কারণে এগুলো আধুনিক কালের বা কিছু পূর্বের বলে মত প্রকাশ করেছেন কেউ কেউ।[৮] অবশ্য মহুয়ার মতো কোন কোন আখ্যায়িকার বীজ পুরাতন—একথাও কেউ কেউ স্বীকার করেছেন।[৯] ড: আশুতোষ ভট্টাচার্য পালাগুলো খ্রীষ্টীয় ষোড়শ–সপ্তদশ শতাব্দীতে সর্বপ্রথম রচিত হয়েছে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।[১০] ড: আহমদ শরীফ *মৈমনসিংহ গীতিকা*–র সময়কাল নির্ধারণ করেছেন পঞ্চদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত।[১১] ড : দীনেশচনন্দ্র সেন তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকায় পালাগুলোর সময়কাল ষোড়শ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পর্যন্ত নির্ধারণ করেছেন। অবশ্য কোন কোন পালার রচনাকাল চতুর্দশ কিংবা ত্রয়োদশ শতাব্দী বলেও অনুমান করেছেন তিনি। ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিকও এসব পালার অনেকগুলোর রচনাকাল খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে বলে অনুমান করেছেন।[১২]

মৈমনসিংহ গীতিকা–র অন্যতম গবেষক অধ্যাপক আলি নওয়াজ *কাজলরেখা* পালাটিকে রূপকথা বলে সবচেয়ে প্রাচীন হিসেবে নির্দেশ করেছেন। এবং বাকী পালাগুলো 'চন্দ্রাবতীর কাব্য প্রতিভা বিকাশের পর থেকে মুর্শিদাবাদের নবাবের আমলের কিছুকাল পর পর্যন্ত সময়ে অর্থাৎ ১৬শ শতকের শেষ দিক থেকে ১৮শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের মধ্যে রচিত' বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।[১৩]

সমালোচক–গবেষকদের অভিমত থেকে সহজেই বুঝা যায়, গীতিকায় সংকলিত বিভিন্ন পালা একই সময়ে রচিত নয়, বরং এগুলোর রচনাকাল ভিন্ন। তবে ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত বলেই সকলে অনুমান করেছেন।

পালাগুলোর সার্বিক সময়কাল নির্ধারণ করা প্রকৃতপক্ষেই কঠিন। কারণ এগুলো কবে কখন থেকে রচিত হয়ে জনমুখে প্রচলিত হতে হতে বর্তমান রূপ লাভ করেছে তা কারো জানা নেই। তবে এ সমস্ত পালায় চিত্রিত জনজীবন ও সমাজব্যবস্থার রূপ দেখে প্রায় সবাই স্বীকার করেছেন যে, পালাগুলোতে আদিম মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রভাব রয়েছে, যা পালাগুলোর প্রাচীনত্ব নির্দেশ করে।

বস্তুত *মৈমনসিংহ গীতিকা*-র বিভিন্ন পালায় কাহিনীর যে পরিণত রূপ পাওয়া যায় তা একদিনের সৃষ্ট নয়। বরং দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় স্নাত হয়েই কাহিনীর পরিণত রূপ নির্মিত হয়েছে। সাধারণ মানুষ তাদের নিস্তরঙ্গ জীবনে কবে থেকে নিজেদের কাহিনী নিয়ে গীতাভিনয় শুরু করেছে, উপভোগের আসর বসিয়েছে তা কারো জানা নেই। *মৈমনসিংহ গীতিকা*-র কাল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যদি সামাজিক পেশার স্তরবিন্যাস অর্থাৎ পেশাজীবী বা কর্মজীবী মানুষের স্বরূপটি লক্ষ্য করা যায় তাহলেও পালাগুলোর প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সংশয়হীন হওয়া যায়। জীবিকা-সংগ্রহ রীতির ভিত্তিতে মানুষের সমাজকে যে চারটি পর্যায়ে (১. আহরণ ও শিকার যুগ ২. পশুপালন যুগ, ৩. কৃষিযুগ ও ৪. শিল্প যুগ) ভাগ করা হয় [১৪] তার প্রথম তিনটি স্তরেরই শ্রমজীবী মানুষের পরিচয় পাওয়া যায় *মৈমনসিংহ গীতিকা*-তে। এদিক থেকেও পালাগুলোর প্রাচীনত্ব সম্পর্কে দ্বিধাহীন হওয়া সম্ভব। আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ যাযাবর মানুষ, বেদে, শিকারী, জেলে, ওঝা,সাধু সন্ন্যাসী এরা যেমন ধীরে ধীরে এসে মিশে গেছে কৃষিজীবী মানুষের সঙ্গে, তেমনি মাতৃতান্ত্রিক সমাজজীবনের ঐতিহ্য সংস্কার ও বিশ্বাসের সূত্র ধরে তুক-তাক যাদু-টোনা-মন্ত্র-ব্রত এগুলোও প্রভাব বিস্তার করেছে কৃষিজীবী মানুষের দৈনন্দিন জীবনে। যার ছাপ গীতিকার বিভিন্ন পালায় সুস্পষ্ট।

প্রকৃতপক্ষে গীতিকার পালাগুলো স্বল্প সময়ের ব্যবধানে রচিত হয় নি বরং সুদীর্ঘ কাল ধরেই রচিত হয়েছে। সমগ্র মধ্যযুগের বিভিন্ন সময়ে এগুলো রচিত হয়েছে। সমালোচকদের অধিকাংশই ষোড়শ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত এগুলোর রচনাকাল নির্দেশ করলেও ষোড়শ শতকের পূর্বেও কোন কোন পালার কাহিনী জনমনে তৈরি হয়ে মুখে মুখে প্রচলিত ছিল—এ অনুমান অসঙ্গত নয়।

১.১

সমগ্র মধ্যযুগে একদিকে যখন সমাজের বিশেষ এক শ্রেণীর মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ সাহিত্য, জীবনী সাহিত্য, রোম্যান্সমূলক গয়োপাখ্যান প্রভৃতির চর্চা চলেছে; অন্যদিকে তখন বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মাঝে চলেছে নিজেদের জীবনভিত্তিক গাথা রচনার প্রচলন। একই সমান্তরালে সাহিত্যের দুটি ধারা ক্রমশ বিকাশলাভ করেছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, সাহিত্যের বোধ নিয়ে যাঁরা সাহিত্য রচনা করেছেন বা যাদের জন্য সাহিত্য রচিত হয়েছে তাদের কাছে দেব-দেবী ও ধর্মকথাকে বাদ দিয়ে মানুষ তখনও বড় হয়ে উঠতে পারে নি। কিন্তু অপর ধারাটিতে মানুষই সব

কিছুর উর্ধ্বে। কোন দেবীর স্বপ্নাদেশে নয়, কোন সামন্ত প্রভু বা শাসকের আদেশ বা পুরস্কারের লোভে নয়, বিশেষ কোন ধর্মবোধের দ্বারা তাড়িত হয়েও নয়--বরং গীতিকার কবিরা স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে নিজেদের আনন্দ-বেদনার কাহিনী নিজেদের ভাষায় নিজেদের জন্য রচনা করেছেন। এগুলো মানুষের জন্য মানুষের নিজেদের জীবন কাহিনী-সমৃদ্ধ, মানুষের নিজেদের তৈরী সাহিত্যকীর্তি। শুধু তাই নয়, মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের বৈষয়িক সমস্যা সংকটের চিত্র এখানে থাকলেও বেশি প্রাধান্য পেয়েছে তাদের হৃদয়ের কথা, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবাবেগের কথা। যার প্রকাশে সমাজ ও ধর্ম তেমন বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি। প্রায় প্রতিটি চরিত্রের প্রাণ-চাঞ্চল্য, প্রাণের সজীব স্পন্দনে গীতিকাগুলো মুখর, শত নির্যাতনে নিষ্পেষণেও যার গতি রোধ করা যায় নি। গীতিকার পালাগুলোর আবেদন তাই সার্বজনীন।

এ সমস্ত পালায় মানুষের যে জীবন ও সমাজ প্রতিফলিত হয়েছে তা 'বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের বস্তু অবলম্বন হইতে অনেকটা স্বতন্ত্র প্রকৃতির। এখানে জীবন অনেকটা ধর্মবন্ধনমুক্ত এবং স্বাধীন আবেগের দুর্দম-শক্তিচালিত।'[১৫] বস্তুত মানুষের ব্যক্তিসত্তার, স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা, তার হৃদয়ানুভূতির কথা বলা হয়েছে গীতিকার বিভিন্ন পালায়। ব্যক্তিহৃদয়ের সংকট এখানে সমাজকে, গোষ্ঠীকে প্রভাবিত করে। ধর্ম ও সমাজের অনুশাসনের বন্ধনে মানুষের হৃদয় ও আবেগ বন্দী নয়। পালাগুলোর প্রায় সব প্রধান নারী পুরুষ চরিত্র তাদের হৃদয়াবেগকেই গুরুত্ব দিয়েছে বিশেষ করে নারী চরিত্রগুলো এ। ব্যাপারে একেবারেই দ্বিধাহীন। মধ্যযুগের সাহিত্যের অন্যান্য ধারায় যখন মানুষ সবেমাত্র দেব-দেবীর আশ্রয়ে সাহিত্যে ঠাঁই পেয়েছে, সেখানে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের, তার হৃদয়ানুভূতির প্রকাশ ও তার স্বীকৃতির প্রশ্নই আসে না। সেক্ষেত্রে *মৈমনসিংহ গীতিকা-র* বিভিন্ন পালায় মানুষ বিশেষ করে নারীর স্বতন্ত্র অস্তিত্বের ঘোষণা, তার হৃদয়ের অকপট প্রকাশ, তার শক্তিমত্তা, বুদ্ধিমত্তা, প্রেমে একনিষ্ঠা ও ত্যাগে পরাকাষ্ঠার যে পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে তা সত্যিই বিস্ময়কর।

আসলে পূর্ব ময়মনসিংহের ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক পরিবেশের দুর্গমতা প্রায় সব সময়ই একে রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা থেকে দূরে রেখেছে। এজন্য পূর্ব ময়মনসিংহের জনজীবনে এক সহজ স্বাভাবিক গতি, শাস্ত্র-শাসনমুক্ত এক উদার পরিবেশ লক্ষণীয়। এমন কি ব্রাহ্মণ্যবাদী সেন রাজবংশ প্রবর্তিত বর্ণভেদ ও কৌলিণ্যপ্রথার প্রভাব থেকেও পূর্ব ময়মনসিংহ মুক্ত ছিল। 'সেন বংশীয় রাজগণ

পশ্চিম মৈমনসিংহ অধিকার করিলেও বহু বিল সমন্বিত, নদীমাতৃক, বর্ষায় দুর্গম ও অরণ্যবহুল পূর্ব্ব প্রদেশ কিছুতেই আয়ত্ত করিতে পারেন নাই।'[১৬] ফলে পূর্ব ময়মনসিংহ দীর্ঘকাল পর্যন্ত স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে শাস্ত্র-ধর্মবন্ধন মুক্ত এক উদার সাংস্কৃতিক পরিবেশ বজায় রাখতে পেরেছে। সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনা বা রাজনীতি থেকে পূর্ব ময়মনসিংহ এলাকা বিচ্ছিন্ন ছিল। গীতিকার বিভিন্ন পালায় রাজনৈতিক দিকটি তাই একেবারে অনুপস্থিত। মোটামুটিভাবে স্বয়ম্ভর গ্রামসমাজ ছিল। সামাজিক বিভেদ প্রকট ছিল না, মোটামুটি সামাজিক সাম্য ছিল।

এ-কারণে *মৈমনসিংহ গীতিকা-য়* পল্লীকবিদের কাছে ধর্মীয় কোন আদর্শ বা সংস্কার বড় হয়ে দেখা দেয় নি, কোন দেব-মূর্তিও তাদের সামনে ছিল না। তাদের রচনায় শুধুমাত্র রক্তমাংসে গড়া মানুষ, তাদের হৃদয়ের বিচিত্র অনুভূতি ও অভিব্যক্তির কথাই প্রাধান্য পেয়েছে। এখানে যে ধর্মের কথা উচ্চারিত হয়েছে, যে ধর্মের জয় ঘোষিত হয়েছে তা হলো মানবধর্ম। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষই এখানে বড়। হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম ও সমাজনীতির সামান্য ছাপ থাকলেও চরিত্রগুলোর হৃদয়ের পরিচয়ই গুরুত্ব পেয়েছে। শাশ্বত মানবীয় আবেগ ও মূল্যবোধই মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। ধর্ম-শাস্ত্র-সমাজ তাদের আবেগের অনুসারী হয়েছে মাত্র।

১.২

মৈমনসিংহ গীতিকা-র প্রায় সব পালাই নারীর প্রেম-কাহিনীবিষয়ক। এখানে নারীর বিবাহ-পূর্ব প্রণয়, পরিণয়ের ক্ষেত্রে তাদের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, পরিণত বয়সে বিয়ে সর্বোপরি প্রেমের নিঃসংকোচ প্রকাশ থাকায় ধারণা করা হয় 'আদিম মাতৃতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তির উপর এই গীতিকাগুলোর সমাজজীবন মূলত পরিকল্পিত হয়েছিল।' [১৭] কিন্তু মৈমনসিংহ গীতিকায় আদিম মাতৃতান্ত্রিক সমাজের পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে এবং কোন কোন কাহিনীতে সে সমাজের সংস্কার ও বৈশিষ্ট্য বর্তমান-একথা স্বীকার করে নিয়েও বলা চলে এগুলো সেই সময়ের বা সেই সমাজেরই কাহিনী নয়। বরং চিরন্তন গ্রাম বাংলার বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ও তাদের সুখ-দুঃখের কাহিনী। এখানে বাল্য— বিবাহ, গৌরীদান প্রথা- এ বিষয়গুলো তেমন প্রত্যক্ষ করা যায় না, একথা ঠিক। বরং নারীর মুক্ত জীবনাকাঙক্ষা ও স্বাধীন প্রণয়বাসনার প্রকাশ লক্ষণীয়। তাই বলে এ কথা প্রমাণিত হয় না,

মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা তখনও প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সমাজের উচ্চাসনে ছিল নারীর স্থান। বরং দেখা যায় পুরুষ-শাসিত সমাজে নারীরা পুরুষের দ্বারা বিভিন্নভাবে হয়েছে নির্যাতিত, নিপীড়িত ও নিগৃহীত। নিজেদের ইচ্ছা ও ক্ষমতানুযায়ী নারীকে পণ্যের মতো বিক্রি করা থেকে শুরু করে, বিনা অপরাধে তালাক দেয়া, দাসীর মতো ব্যবহার করা, মিথ্যে অপবাদে অভিযুক্ত করা, অপহরণ করা, একাধিক বিয়ে করা, নারীর প্রেমের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা—ইত্যাদি সর্বপ্রকার অবিচার পুরুষেরা করেছে। এমন কি বিবাহোত্তর, জীবনেও পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি নারীর জীবনকে করেছে দুর্বিষহ, করুণ ও মর্মান্তিক। তা সত্ত্বেও *মৈমনসিংহ গীতিকা*-র নারী চরিত্রগুলো বিশেষত্ব লাভ করেছে তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের স্বাতন্ত্র্যে, নারীধর্মের দৃঢ়তায়, প্রেমের একনিষ্ঠায়। প্রাত্যহিক জীবনাচরণে, তাদের ব্যক্তিত্বময়তায়, চারিত্রিক দৃঢ়তায়, প্রেমে-নিষ্ঠায়, ত্যাগ-তিতিক্ষায় এরা সত্যিই উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত।

গীতিকার বিভিন্ন পালায় নারী চরিত্রের এই অপূর্ব মহিমান্বিত রূপটি প্রকাশ পেয়েছে পল্লীকবির সহজ সরল অনবদ্য প্রকাশভঙ্গিতে। পল্লীরমণীর জীবনের ব্যর্থ ও অভিশপ্ত প্রেমকাহিনী, তাদের করুণ জীবনের বর্ণনা কবিগণ দর্শক-শ্রোতার সামনে উপস্থাপন করতে গিয়ে নারীদের সামাজিক অবস্থান, প্রাত্যহিক জীবনাচরণ, তাদের নিঃসঙ্গতা ও অসহায়ত্বকে ফুটিয়ে তুলেছেন। শুধু বাইরের অত্যাচারের কাহিনী নয়, হৃদয়ানুভূতির উপর নির্যাতনের করুণ কাহিনীও ঠাঁই পেয়েছে এসব পালায়। মানুষ হিসেবে নারীর হৃদয়বৃত্তিজাত আবেগকে উর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন পালাকারগণ। সমাজে কিংবা জীবনে না হলেও অন্তত পালাকারদের রচিত গানে নারী তার মূল্য পেয়েছে। গীতিকার নারী চরিত্রগুলো তাই এত উজ্জ্বল ও প্রাণময়। 'গাথাগুলো একাধারে নারী নির্যাতনের ও নারী মহিমার প্রচারকাব্যও। উনিশ শতকের আগে নারীর প্রতি এত শ্রদ্ধা বা মমতা সুলভ ছিল না জীবনে কিংবা শাস্ত্রে ও সমাজে।'[১৮]

তবে নারীজীবনের প্রেমকাহিনী মুখ্য বিষয় হলেও আপামর মানুষের বিচিত্র অনুভূতি ও অভিব্যক্তির প্রকাশে পালাগুলো সমৃদ্ধ। রাগ, ক্রোধ, হিংসা ঈর্ষা, নিষ্ঠুরতা, স্বার্থপরতা মানুষের প্রবৃত্তিরই কুৎসিত অথচ বাস্তব দিক। মানুষের হৃদয়ের প্রেম-ভালোবাসা যেমন সত্য, এই নেতিবাচক দিকগুলোও তেমনি সত্য। কাজেই এগুলোকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। পালাকারগণ বহুমুখী ও বৈচিত্র্যপূর্ণ চরিত্রগুলোকে দর্শক-শ্রোতার জন্য তুলে আনতে পেরেছেন তাদের

অসাধারণ পর্যবেক্ষণশক্তির দ্বারা। সমাজকে, সমাজের মানুষকে সামগ্রিকভাবে অবলোকন করতে সক্ষম হয়েছেন। তারা তাদের চারপাশের প্রাত্যহিক জীবন ও জগৎ থেকেই কাহিনী ভাব, ভাষা, চরিত্র ইত্যাদি সবকিছু সংগ্রহ করেছেন। ফলে কোনরূপ কৃত্রিমতা এখানে ঠাঁই পায় নি। অকৃত্রিমতাই পালাগুলোর প্রধান গুণ। কাহিনী নির্বাচনে, ঘটনাবিন্যাসে, চরিত্র-চিত্রণে প্রতিটি ক্ষেত্রে কবিগণ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনবোধের গভীরতার যে পরিচয় দিয়েছেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়।

২

মৈমনসিংহ গীতিকা-য় সংকলিত পালা দশটির চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য মোটামুটিভাবে অভিন্ন। আলোচ্য প্রবন্ধে দশটি পালা নিয়ে আলোচনা না করে আমরা প্রতিনিধিত্বমূলক চারটি পালাকে কেন্দ্র করে *মৈমনসিংহ গীতিকা-র* জনজীবন ও স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে সচেষ্ট হবো। নির্বাচিত পালা চারটি হচ্ছে *মহুয়া, মলুয়া, কঙ্ক ও লীলা* এবং *দেওয়ানা মদিনা*। দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত *মৈমনসিংহ গীতিকা-য়* সংকলিত' [১৯] উক্ত পালা চারটিই আমাদের আলোচনার ভিত্তি।

আলোচ্য পালা চারটির কাহিনীই গড়ে উঠেছে নর-নারীর প্রেমকে কেন্দ্র করে। *'মহুয়া* এবং *'কঙ্ক ও লীলা'* পালা দুটি বিবাহ-পূর্ব অসম প্রেমের কাহিনী। *'মলুয়া'* এবং *'দেওয়ানা মদিনা'* বিবাহোত্তর প্রেমের অর্থাৎ দাম্পত্যপ্রেমের কাহিনী। বিবাহ-পূর্ব এবং বিবাহোত্তর--উভয় প্রেমই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত। এ ব্যর্থতার কারণ বিভিন্ন পালাতে বিভিন্ন রকম। প্রেমের ক্ষেত্রে সংঘাত এসেছে কখনও গোষ্ঠীগত ও ব্যক্তিক চেতনাজাত দ্বন্দ্বের কারণে, সম্প্রদায়ের ভিন্নতার কারণে, ক্ষমতাবান পুরুষের স্বার্থোদ্ধারজনিত ষড়যন্ত্রের কারণে, কখনও বা আভিজাত্যের মোহে।

'মহুয়া' পালায় নায়িকা মহুয়া ব্রাহ্মণকন্যা হলেও বেদের দলে লালিত ও বর্ধিত। সমতল ভূমির ব্যক্তিক জীবন থেকে পাহাড় বনাঞ্চলের দুর্গম পরিবেশের গোষ্ঠীগত জীবনে জড়িয়ে যায় সে। পরবর্তী পর্যায়ে দ্বন্দ্ব এসেছে এ পথেই। যাযাবর জীবনের এক সময়ে পরিচয় হয় সমতল ভূমির তরুণ জমিদার নদের চাঁদের সঙ্গে। উভয়ে উভয়ের প্রেমে পড়ে। গোষ্ঠীবদ্ধ বেদে সম্প্রদায়ের মক্ষীরাণীর মধ্যে জেগে ওঠে তার ব্রাহ্মণকন্যার ব্যক্তিক সত্তাটি। *মহুয়া* ভুলে যায় তার গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন, উপেক্ষা

করে সে জীবন-বিধান। ধরা দেয় নদের চাঁদের কাছে। ভিন্ন দুই সম্প্রদায় ও সমাজজীবনের তরুণ-তরুণীর প্রেমের পথে বিরোধিতা আসে সহজেই। শুরু হয় সংঘাত। মহুয়ার পালক পিতা বেদে দলের সর্দার হোমরার বিরোধিতায় শেষ পর্যন্ত তারা অনিশ্চিতের পথে পা বাড়ায়। একের পর এক বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে সামান্যকাল সুখী জীবন যাপনের সুযোগ পেলেও এক সময় মহুয়া নদের চাঁদ ধরা পড়ে হোমরার কাছে। হোমবার দেয়া বিষলক্ষের ছুরি মহুয়া নদের চাঁদের বুকে না বসিয়ে বসায় নিজের বুকে। ক্রোধে উন্মত্ত হোমরার নির্দেশে নদের চাঁদকেও হত্যা করা হয়। এভাবেই একটি সুন্দর প্রেমের করুণ সমাপ্তি ঘটে।

'মলুয়া' পালাতে নায়িকা মলুয়া ধনী গ্রাম্য মোড়লের সুন্দরী কন্যা, নায়ক চান্দ বিনোদ সাধারণ কৃষক এবং শিকারী। তাদের বিবাহোত্তর অনুরাগ, প্রণয় এবং পরিণয়ের সূত্রে সুখী জীবনের ভিত্ গড়লেও খুব শীঘ্রই তা ভেঙে পড়েছে। মলুয়ার রূপে আকৃষ্ট ক্ষমতাবান কাজীর বারংবার ষড়যন্ত্রে মলুয়াকে দেওয়ানের হাবলীতে কাটাতে হয় তিন মাস। প্রায়শ্চিত্ত করে মলুয়ার স্বামী চান্দ বিনোদ জাতে উঠলেও সমাজ মলুয়াকে ক্ষমা করে না। প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত, কাজীর ষড়যন্ত্র ও অত্যাচারে দুর্বল চান্দ বিনোদ সহজেই মেনে নেয় সমাজকে। নতুন করে সংসারী হয়। লম্পট কাজীর ষড়যন্ত্র, দেওয়ানের নারীলিপ্সা, চান্দ বিনোদের পৌরুষহীনতার গ্লানি বহন করতে হয় একাকী মলুয়াকে। তাই তীব্র অভিমানে নীরব প্রতিবাদে অকাল মৃত্যুকে বরণ করে নেয় মলুয়া। এভাবে বিবাহোত্তর জীবনেও নারীর প্রেম পুরুষের লালসা ও ক্ষমতার কাছে হয়েছে লাঞ্ছিত।

'কঙ্ক ও লীলা' পালার কাহিনীটি মহুয়ার মতোই আর একটি অসম প্রেমের কাহিনী। জন্মগতভাবে এ পালার নায়ক নায়িকা সম-গোত্রের। নায়ক কঙ্ক ব্রাহ্মণ পুত্র হলেও শৈশবেই মা-বাবা হারিয়ে চণ্ডাল গৃহে বেড়ে ওঠে। এটাই পরবর্তীতে তার প্রেমের পথে সংঘাতের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। চণ্ডাল গৃহের আশ্রয়চ্যুত হওয়ার পর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের গৃহে পণ্ডিত কন্যা লীলার সাথে বড় হয় এবং শিক্ষালাভ করে কঙ্ক। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রেম জন্মে দু'জনার হৃদয়ে। কঙ্ক মুসলমান পীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। এবং পীরের আদেশে *সত্যপীরের পাঁচালি* রচনা করে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গর্গ কঙ্ককে জাতিতে তুলে নিলে শুরু হয় সংঘাত। সমাজপতিগণ 'চণ্ডাল-পুত্র' 'মুসলমান পীরের শিষ্য' কঙ্কের সঙ্গে লীলার নাম জড়িয়ে কলঙ্ক রটিয়ে দেয়। বিভ্রান্ত গর্গের আচরণে ঘরছাড়া হয় কঙ্ক। এক সময় গর্গ নিজের ভুল বুঝতে

পারলেও কঙ্কের বিরহে লীলা মৃত্যু শয্যায় ঢলে পড়ে। অনেক পরে কঙ্ক ফিরে আসে, কিন্তু লীলা তখন শ্মশানের চিতায়। প্রেমের জন্য লীলা এভাবেই অকালে ঝরে যায়, তবে সরবে নয়, বড়ড নীরবে।

আমাদের আলোচ্য সর্বশেষ পালা *'দেওয়ানা মদিনা।'* বিবাহোত্তর দাম্পত্য প্রেমের কাহিনী হলেও নায়ক-নায়িকার সামাজিক অবস্থানের বৈষম্যই এর সংকটকে ঘনীভূত করেছে। নায়িকা মদিনা সাধারণ গৃহস্থ-কন্যা। নায়ক দুলাল অভিজাত দেওয়ান-পুত্র। সৎমার ষড়যন্ত্রে গৃহস্থ বাড়িতে আশ্রিত। অতঃপর গৃহস্থ-কন্যা মদিনার সঙ্গে তার বিয়ে হয় এবং সুখী গৃহস্থ জীবনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে দুলাল। কিন্তু সংঘাত আসে খুব শীঘ্রই। বড় ভাই আলাল অভিজাত্যের প্রশ্ন নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়। দুলাল কিছুটা দ্বিধাগ্রস্থ হলেও শেষ পর্যন্ত সহজ সমাধান হয়ে যায় সাধারণ এবং অভিজাত শ্রেণীসংকটের। বিনা দোষে তালাকপ্রাপ্ত হয় গৃহস্থকন্যা মদিনা। স্বামীর প্রতীক্ষায় দিন গোনে সে। এক সময় সরল বিশ্বাস ভাঙে। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সকল প্রতীক্ষা ও যন্ত্রণার অবসান ঘটে। কাহিনীর শেষ পর্যায়ে অভিজাত স্বামী দুলাল সব ছেড়ে ফিরে আসলেও তার অভিজাত্যের অহংবোধ মদিনার জীবনে আনে নির্মম পরিণাম।

মৈমনসিংহ গীতিকা-র সাধারণ বৈশিষ্ট্য এ পালাগুলোতে সুস্পষ্ট। চারটি পালাই প্রেম-বিষয়ক এবং প্রতিটি পালাতেই প্রেমের ক্ষেত্রে নারীর একনিষ্ঠা ও আত্মত্যাগ দেখানো হয়েছে। কাহিনীগুলো তাই নায়িকা প্রধান। নারী ধর্মের দৃঢ়তায় এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে এরা অত্যন্ত উজ্জ্বল। কোন কাহিনীতেই প্রেম তার স্বাভাবিক পথে চলতে পারে নি। বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে বারংবার। সমাজ-শাস্ত্র-মানুষ বিভিন্ন পথে সংঘাতের সৃষ্টি করেছে। মানুষের বৈষয়িক স্বার্থচিন্তা, লালসা কাতরতা, অর্থহীন শাস্ত্রবুদ্ধি, আভিজাত্যবোধ ইত্যাদি বিচিত্র পথে এসেছে বিরোধিতা। কিন্তু নারীর জীবনে জাগ্রত প্রেম শত বিপত্তির মুখেও সামনে এগিয়ে গেছে অপ্রতিরোধ্য গতিতে। তারা মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছে নিঃসংকোচে। কিন্তু আপন মহিমাকে ক্ষুন্ন করে নি। মহুয়া মলুয়া দুঃসহ সংগ্রামের পরেও শেষ রক্ষা করতে পারে নি সত্য, কিন্তু আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে তাদের প্রেমের জয় ঘোষণা করে গেছে। লীলা ও মদিনা নীরবে মৃত্যুবরণ করলেও প্রকৃতপক্ষে তারা ধিক্কার জানিয়ে গেছে সমাজকে। এদের কেউই প্রেমাস্পদকে নিয়ে জীবনের সাধ-আহলাদ উপভোগ করতে পারেনি।

পালা চারটিতে কাহিনীর পরিণতির দিক থেকে একটা ঐক্য লক্ষণীয়। প্রতিটি কাহিনীতেই প্রেমের পরিণতি মৃত্যু—একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, মৃত্যুর পরে হলেও প্রেমের স্বীকৃতি মিলেছে। শাস্ত্র-ধর্ম-সমাজ ও মানুষের সমস্ত স্বার্থবুদ্ধিকে উপেক্ষা করে নর-নারী হৃদয়ের প্রেমানুভূতিই জয়ী হয়েছে। '*মহুয়া*' পালাতে মহুয়া-নদের চাঁদের মৃত্যুর পর হোমরা বেদে অনুতপ্ত হয়েছে। গোষ্ঠী চেতনা ও ব্যবসায়িক স্বার্থে হোমরা মহুয়ার প্রেম মেনে নিতে পারে নি। কিন্তু মহুয়া নদের চাঁদের মৃত্যু হোমরার ব্যর্থতাকেই চিহ্নিত করেছে। ব্যর্থতা ও পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে সবদিক থেকেই নিঃসঙ্গ ও অবলম্বনহীন হয়েছে হোমরা বেদে নিজে। বিজয়ী হয়েছে মহুয়া ও নদের চাঁদের প্রেম।

মলুয়া পালায় দেখা যায়, চান্দ বিনোদ নিশ্চিত জীবনে সুখ ভঙ্গের আশঙ্কায় সমাজপতি ও আত্মীয় স্বজনের কথা মেনে নেয়। নতুন স্ত্রী নিয়ে সংসারী হয়। মলুয়া নিজ সংসারে দাসীবৃত্তি করলেও সে নিশ্চুপ। কিন্তু কাহিনীর শেষ দৃশ্যে বিনোদের মুখেও সমাজ সংসারকে অস্বীকার করার প্রতিশ্রুতি শোনা যায় : 'চান্দ সুরুজ ডুবুক আমার সংসারে কাজ নাই/ জ্ঞাতি বন্ধু জনে আমি আর ত নাই চাই'। সুতরাং বিনোদের প্রতিশ্রুতি—'ঘরে তুইল্যা লইবাম তোমায় সমাজের কাজ নাই।'[২০] বিনোদের এই ক্ষীণ আশ্বাসে মলুয়া তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন না করলেও বিনোদের আর্তিতে সমাজের নিষ্ঠুরতা ও জাত ধর্মের অসারতা ধরা পড়েছে। '*কঙ্ক ও লীলা*'তেও দেখা যায়, গর্গ তার ভুল বুঝতে পারে। লীলার মৃত্যুর পর অনুশোচনায় গর্গ কঙ্কের সঙ্গে সংসার ত্যাগ করে নীলাচলের উদ্দেশ্যে। *দেওয়ানা মদিনা-য়* অনুশোচনার তীব্র দহন দুলালকে তাড়িয়ে এনেছে। মদিনার প্রেম প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। প্রতীক্ষিত জীবনে মদিনা দুলালকে ফিরে পায় নি, পায় নি তার প্রেমের মর্যাদা। আভিজাত্য সেখানে প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু মৃত্যুর পরে হলেও সে প্রাচীর ভেঙেছে। নারীর প্রেমের শক্তি মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আভিজাত্যের অহমিকাকে ধূলিলুণ্ঠিত করেছে। দুলাল নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে : 'দেওয়ান গিরির লোভে আমি করিলাম বেসাতি/ জমিনের ধূলার লাগ্যা ছাড়লাম ইরামতি।'[২১] অনুতাপে অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে শেষ পর্যন্ত 'ফকীর সাজিল দুলাল দেওয়ানগিরি থুইয়া।'[২২]

এভাবে চারটি পালাতেই প্রেম ব্যর্থতার মাঝে পরিণতি লাভ করলেও শেষ পর্যন্ত প্রেমই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। স্বীকৃতি পেয়েছে তাদের কাছে, যারা একদিন বিরোধিত করেছিল কিংবা বিভ্রান্তির মধ্যে ছিল। প্রেমের একনিষ্ঠায় নারী মৃত্যুর পরেও

অমর, তার শক্তিতে বলীয়ান ও মহীয়সী। গীতিকা-র পালাগুলো সবকিছুর উর্ধ্বে; তাই নারীর হৃদয়ের এবং তার প্রেমের জয়গানে মুখর।

২.১

আমরা জানি স্ব-সমাজের মানুষের উপভোগের জন্যই অশিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিত কবি কর্তৃক এসব পালা রচিত। সমাজের মানুষের সমর্থন নিয়েই এ-পালাগুলো প্রচলিত হয়ে এসেছে। কাজেই কাহিনীর বাস্তবতা এবং এর গ্রহণযোগ্যতা ছিল একটি বড় প্রশ্ন। এসব কাহিনীর মধ্যে সাধারণ মানুষ তাদের জীবনের মিল খুঁজে পেয়েছে— এটা ধারণা করা স্বাভাবিক। কাহিনীর পরিণতিতেও জনগণের আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশারই ছাপ রয়েছে হয়তো। এভাবেই জনগণের কাছে কাহিনী গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। কবি যখন কাহিনী উপস্থাপন করেন তখন সেই কাহিনীর চরিত্র কিংবা বিষয়বস্তুর সঙ্গে দর্শক যদি নিজেদের অভিজ্ঞতা, চিন্তা ও বাস্তব অবস্থার ঐক্য খুঁজে পায় তাহলে সেই কাহিনীর সাথে দর্শকদের একটা যোগসূত্র স্থাপিত হয়। কাহিনীর চরিত্র-সমূহের যে জীবন, যে জীবন-যন্ত্রণা ও সংকট তার সাথে দর্শক ও কথকের বর্ণনার একাত্মতা ঘটলো কিনা তার উপরেও কাহিনীর গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে। কবির বর্ণিত কাহিনী ও চরিত্রের সঙ্গে দর্শকের যোগসূত্র এবং একাত্মতা আলোচ্য পালাগুলোর ক্ষেত্রে অবশ্যই কার্যকর। পুরুষানুক্রমে এগুলো তাই প্রচলিত হয়ে এসেছে মুখ থেকে মুখে। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে, 'পালাগানের অধিকাংশই পূর্ব্ব-মৈমনসিংহের কোন কোন যথার্থ ঘটনা অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। যে সকল অশ্রুসিক্ত হইয়া লোকেরা শুনিয়াছে, সকল অবাধ ও অপ্রতিহত যমের দুর্জয় চক্রের ন্যায় সরল নিরীহ প্রাণকে পিষিয়া চলিয়া গিয়াছে-সেই সকল অপরূপ করুণ কথা গ্রাম্য কবিরা পয়ারে গাঁথিয়া রাখিয়াছেন।'[২৩]

বস্তুত কাহিনীগুলোর প্রেক্ষাপট বা ঘটনা বাস্তব কোন সত্যকে কিংবা প্রচলিত কিংবদন্তীকে ভিত্তি করে রচিত হওয়ার কারণে এগুলো সহজেই জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের শিশু কন্যা চুরির ঘটনা হয়তো কখনও সত্য ছিল। আর বেদের দলে যে সাধারণত সুন্দরী কোন মেয়ে খেলা দেখায় তাও গ্রামীণ সমাজে অপরিচিত নয়। এহেন রূপসীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তার প্রেমে পাগল হওয়াও অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাই এ ঘটনা নিয়ে তৈরী মহুয়া পালা শোনার পর দর্শকরা

খুব সহজেই তা গ্রহণ করতে পেরেছে। তেমনি *মলুয়া*, কঙ্ক ও লীলা, দেওয়ানা *মদিনা* পালার কাহিনীও জনগণের অভিজ্ঞতা ও সমর্থন নিয়ে গড়ে উঠেছে। কাহিনীর পরিণতিতে দর্শক শ্রোতার আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশাকে প্রাধান্য দেয়া হলেও বাস্তবের সঙ্গে হয়তো মিশে গেছে কল্পনার সামান্য রঙ। কিন্তু সে রঙ বাস্তবকে আচ্ছন্ন করে নি। বাস্তবকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার আকাঙ্ক্ষায় কল্পনার মিশ্রণ ঘটেছে। বাস্তবে মহুয়া-নদের চাঁদের, কঙ্ক ও লীলার যে ভিন্ন সামাজিক অবস্থান তাতে তাদের মিলন সহজ স্বাভাবিকভাবে গ্রহণযোগ্য হতো না। তাই তাদের আত্মত্যাগ জনগণের মনে বেদনার সৃষ্টি করলেও বিকল্প কিছু হয়তো জনগণের প্রত্যাশার অনুকূলে ছিল না। ঠিক তেমনি চান্দ বিনোদ ও দুলালের দ্বিতীয় সংসার জীবনে দেওয়ানের হাবলীতে কাটিয়ে আসা মলুয়া এবং সাধারণ গৃহস্থ কন্যা মদিনার ঠাঁই হয় না বলেই মৃত্যু তাদের মুক্তির সহজ উপায় বলে বিবেচিত হয়েছে। মোটের উপর প্রাত্যহিক জীবনের জটিল ও দ্বন্দ্বমুখর সমস্যার সমাধান কবি বা দর্শক-শ্রোতা কারোই জানা ছিল না। তাই কবিরা তাদের কাহিনীতে এমন পরিণতি দান করেছেন, যাতে তা সর্বজনগ্রাহ্য হয় এবং কাহিনীও তার সৌন্দর্য না হারায়।

•

কাহিনীর পরিণতির কথা বাদ দিলেও বিভিন্ন পালায় নায়ক-নায়িকার পূর্বরাগ, তাদের প্রেম, প্রেমে সমাজ সংসার ও মানুষের বিরোধিতা, অভিজাত শ্রেণী ও ক্ষমতাবান পুরুষের নারীলিপ্সা, স্বার্থোদ্ধারের জন্য ষড়যন্ত্র, অত্যাচার ও নিপীড়ন, সমাজপতি ও আত্মীয়স্বজনদের নিষ্ঠুরতা, মিথ্যে আভিজাত্যবোধ ও শাস্ত্রজ্ঞান, সাধু সন্ন্যাসীদের লালসাকাতর আচরণ, গ্রামীণ গার্হস্থ্য জীবন, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের বিপন্ন জীবনচিত্র, সর্বোপরি ভালো, মন্দে মেশানো সর্ব শ্রেণীর মানুষের যে মানবীয় সহজ স্বাভাবিক আচরণ ইত্যাদি সবই প্রাত্যহিক বাস্তবতায় সমৃদ্ধ। তাই এসব উপাদান সংকলিত কাহিনী দর্শক-শ্রোতাদের হৃদয়ের সমর্থন পেয়েছে। তাছাড়া *মৈমনসিংহ গীতিকা*-র অন্যান্য পালার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আলোচ্য পালা চারটিতেও লক্ষ্য করা যায়, কবির আকর্ষণ বা মনোযোগ অত্যাচারী মানুষের উপর নয়, অত্যাচারিতের উপর। অভিজাত শ্রেণীর উপর নয় বরং সাধারণ শ্রেণীর মানুষের উপর। এজন্যই গীতিকাতে জমিদার, কাজী, দেওয়ান ইত্যাদি চরিত্রের চেয়ে সাধারণ শ্রেণীর চরিত্র এবং বিশেষ করে নারী চরিত্রের বর্ণনায় কবির দরদ ও সহানুভূতি লক্ষণীয়। এর পেছনেও কাজ করেছে দর্শক-শ্রোতার ভূমিকা। তাদের মনোরঞ্জন ও মনোতুষ্টিই ছিল কবিদের লক্ষ্য। এবং তারা নিজেরাও ছিলেন এই

সাধারণ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তবে কোন চরিত্র উপেক্ষা বা অবিচার পেয়েছে---একথা বলা যাবে না।

২.২

মৈমনসিংহ গীতিকা-র পালাগুলো কখনই সামাজিক প্রেক্ষাপটের বাইরে জনবিচ্ছিন্ন কাহিনী হিসেবে গড়ে ওঠে নি। কৃষিনির্ভর সামন্তবাদী সমাজজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রায় সর্বস্তরের জনমানবের চিত্রই এখানে রয়েছে। বস্তুত গীতিকার বিভিন্ন পালার কাহিনীবিন্যাস এমন যে, সমাজজীবনের সর্ব পর্যায়ের মানুষ এখানে উঠে এসেছে। কাহিনীর প্রয়োজনেই এরা এসেছে নিজ নিজ ভূমিকায়।

নারী ও পুরুষের সামাজিক, ধর্মীয়, ও রক্তের বন্ধনসূত্রে গড়ে-ওঠা সম্পর্কের আওতাভুক্ত সবাই এখানে এসেছে। অর্থাৎ একজন নারী বা পুরুষ তার জীবনের বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন পর্যায়ে যতোগুলো ভূমিকা গ্রহণ করে তার সবগুলোই গীতিকার পালায় ঠাঁই পেয়েছে। শুধু তাই নয়, গীতিকার মানুষকে সামাজিক মর্যাদা বা অবস্থানের দিক থেকে শ্রেণীকরণ করা হলেও দেখা যাবে, তাদের শ্রেণীচরিত্র এক নয়, বহুবিধ এবং বিচিত্র। সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে প্রথমেই যে দুটো শ্রেণীচরিত্রের ছবি ভেসে ওঠে, তা হলো উচ্চ-শ্রেণী এবং নিম্ন-শ্রেণী। পেশাগত, বংশগত এবং ঐশ্বর্যগত দিক থেকে এ ভেদাভেদ গড়ে উঠেছে। '*মৈমনসিংহ গীতিকা* সর্বস্তরের জীবন সংবলিত বাংলা সাহিত্যের স্থায়ী জাতীয় সম্পদ। পীর, ব্রাহ্মণ, শুদ্র, দেওয়ান, জমিদার, নফর, পণ্ডিত, রাখাল, ডাকাত, বেদে-বেদেনী কিষাণ-কিষাণী সবাই *মৈমনসিংহ গীতিকা*-র নায়ক-নায়িকা, পাত্র-পাত্রী।'[২৪] এই বিচিত্র শ্রেণীর জনজীবনকে ঘিরেই মৈমনসিংহ গীতিকার পালাগুলো বিন্যস্ত হয়েছে। হিন্দু-মুসলমান, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, শিকারী-জেলে, দাস-দাসী সর্বস্তরের মানুষের পরিচয় রয়েছে এ সমস্ত পালায়।

আলোচ্য চারটি পালার পাত্র-পাত্রীও সমাজের বিভিন্ন স্তরের। পেশাজীবী বিচিত্র মানুষের ও তাদের জীবনাচরণের পরিচয় এখানেও বিধৃত। কৃষি-নির্ভর জীবনে কৃষিজীবী মানুষের ছবি এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। সামন্তবাদী এই সমাজজীবনের এক স্তরে রয়েছে কৃষিজীবী সাধারণ মানুষ, অন্য স্তরে রয়েছে শাসক শ্রেণী ও বণিক শ্রেণী। প্রত্যেকের কথাই পালাগুলোতে ঠাঁই পেয়েছে। বিভিন্ন পালার

প্রধান ও অপ্রধান চরিত্রগুলো গ্রামবাংলার শাশ্বত মানব-চরিত্র, দোষে-গুণে ভরপুর সহজ সরল জীবনাচরণে অভ্যস্ত। বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর চরিত্রায়ণে জনমানস ও জনজীবনের রূপটি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। *মহুয়া, মলুয়া, কঙ্ক ও লীলা* এবং *দেওয়ানা মদিনা* পালা চারটির নায়ক যথাক্রমে নদের চাঁদ, চান্দ বিনোদ, কঙ্ক এবং দুলাল। প্রথম তিনজনই হিন্দু যুবক, শুধু দুলাল মুসলমান। নদের চাঁদ অভিজাত শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। নিজের অঞ্চলের জমিদার। চান্দ বিনোদ হালুয়া বংশজাত গরিব হিন্দু যুবক মূলত কৃষিজীবী হলেও শিকার তার অপর পেশা। কঙ্ক ব্রাহ্মণ যুবক, কিন্তু ভাগ্যচক্রে চণ্ডালের গৃহে আশ্রিত ও লালিত এবং পুনরায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের গৃহে আশ্রিত। দুলাল অভিজাত শ্রেণীর দেওয়ান-পুত্র হলেও ঘটনাচক্রে সাধারণ কৃষক। এ চরিত্রগুলো বিকাশলাভ করেছে তাদের নিজ নিজ অবস্থানের প্রেক্ষিতে।

নদের চাঁদ সুখী স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনে অভ্যস্ত। জীবিকার জন্য কোন ভাবনা বা সংগ্রাম তার মধ্যে নেই। এদিক থেকে অন্যদের মধ্যে সে-ই ব্যতিক্রম। চান্দ বিনোদ জীবিকার জন্য, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য, অত্যাচারী কাজীর চাহিদা পূরণের জন্য শিকারী সেজে দেশান্তরী হয়েছে, সহায়-সম্পত্তি বিক্রি করেছে। কঙ্ক ও দুলাল অনিশ্চিত জীবনের পেছনে ছুটেছে। কঙ্ক ঠিক জীবিকার জন্য সংগ্রাম না-করলেও শৈশব থেকেই বারংবার আশ্রয়চ্যুত হয়েছে। অবশেষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গর্গের গৃহে নিশ্চিত জীবনের সন্ধান পেলেও তা স্থায়ী হয় নি। অনিশ্চিত জীবনে পা বাড়াতে হয়েছে আবারও। দুলাল ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে সুখী জীবন থেকে বিতাড়িত হয়েছে, তার জীবনও একেবারে সংগ্রামবিহীন নয়।

নদের চাঁদ তার সামাজিক অবস্থান ও পদমর্যাদার কারণেই অনেকটা নির্বিরোধ আবেগতাড়িত চরিত্র। কোন ব্যাপারেই গভীর চিন্তার বহিঃপ্রকাশ নেই তার চরিত্রে। সবকিছু অত্যন্ত সহজ স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে সে। ব্রাহ্মণোচিত সংস্কার বা আভিজাত্যের অহমিকা নেই তার মধ্যে। তাই বলে সে উচ্ছৃঙ্খলও নয়, বেদে কন্যা মহুয়ার কাছে প্রেম নিবেদন না করে ক্ষমতা প্রয়োগ দ্বারা তাকে করায়ত্ত
করার কোন চেষ্টা বা লালসা-কাতরতা তার নেই। বরং নদের চাঁদ তার সামাজিক প্রতিপত্তি, ঐশ্বর্য, সুখী জীবন, বৃদ্ধা মা সবকিছু অনায়াসে বিসর্জন দিয়েছে প্রেমের জন্য। এদিক দিয়ে নদের চাঁদ মহৎ, সুন্দর। প্রেমের জন্য সর্বস্বত্যাগী পুরুষ হিসেবে তার চরিত্র অতুলনীয়। যদিও পুরো পালাটিতে নদের চাঁদের আর কোন সক্রিয় ভূমিকা নেই।

নদের চাঁদ সামাজিক শ্রেণী-বৈষম্যে বিশ্বাসী নয়। সামাজিক চিত্তবিনোদনের পৃষ্ঠাপোষক নদের চাঁদ ইনাম-বখশিশ দিতে কোন কার্পণ্য করে না। হাজার টাকার শাল, বসত বাড়ি অনায়াসেই দিয়ে দেয়। নদের চাঁদ তার সমাজের বিশেষ এক শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেছে। যারা সমাজে মর্যাদা ও ক্ষমতার অধিকারী হয়েও আপন মনুষ্যত্বকে বিসর্জন দেয় না, অহমিকায় অন্ধ হয় না।

বেদে-কন্যা মহুয়ার রূপে আকৃষ্ট হয়ে তাকে প্রেম নিবেদন, মা-বাবাকে ছেড়ে গৃহত্যাগ করা, জাতি বিসর্জন দিয়ে মহুয়ার রান্না খাওয়া, মহুয়ার সঙ্গে নিরুদ্দেশ যাত্রা ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে এক যৌবনাবেগ ও পরম মানবীয় বোধ তার মধ্যে কাজ করেছে। আবেগতাড়িত বলে চরিত্রটির মধ্যে কোন রকম অন্তর্দ্বন্দ্ব বা অন্তর্জ্বালা লক্ষণীয় নয়। প্রেমে একনিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা এই চরিত্রটির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করে ঠিকই, কিন্তু তার করুণ পরিণতি ততোটা দুঃখবোধের জন্ম দেয় না। নদের চাঁদের দুঃখবোধ মহুয়ার দুঃখবোধের তীব্রতার সঙ্গে সামন্তরাল হতে পারে নি। মহুয়ার মধ্যে যে সংগ্রাম যে সক্রিয় বলিষ্ঠ ভূমিকা প্রতিটি পদে পদে লক্ষণীয়, নদের চাঁদ সেখানে অনেকটা নিষ্ক্রিয়। মহুয়ার পাশে নদের চাঁদ তাই অত্যন্ত নিস্প্রভ। আসলে নদের চাঁদের দুঃখ বিবেচনায় কবি ততোটা অন্তরঙ্গ হতে পারেন নি। অভিজাত শ্রেণীর ব্রাহ্মণ তরুণ নদের চাঁদের জীবনাচরণ কবির কাছে ততোটা প্রত্যক্ষ না-থাকাই স্বাভাবিক। কবির মনোযোগও নদের চাঁদের প্রতি ততো গভীর ছিল না। কারণ নদের চাঁদ সেই সুখী নিশ্চিত জীবনের প্রতিনিধিত্ব করেছে, যে-জীবনের সঙ্গে সাধারণ মানুষের নিবিড় বা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল না। নদের চাঁদের জীবনাচরণ, তার আবেগায়িত জীবনধারা সবকিছুই তার স্ব-সমাজের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তবু প্রেমে বিশ্বস্ততা এবং প্রেমের জন্য সর্বস্ব ত্যাগের মহিমাই তাকে নায়কের মর্যাদায় উন্নীত ও মহৎ করেছে।

'মলুয়া' পালার নায়ক চান্দ বিনোদ আবহমান গ্রাম বাংলার সাধারণ তরুণ গৃহস্থ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্ভিক্ষের ফলে বিপর্যস্ত কৃষক। জীবিকার জন্য যাকে সবকিছু বিক্রি করতে হয়, ভাগ্যান্বেষণে ছুটে বেড়াতে হয় দেশ থেকে দেশান্তরে। কোড়া শিকার তার বিপর্যস্ত কৃষিজীবনে সহায়ক পেশা। চান্দ বিনোদের চরিত্র চিত্রণে তার সামাজিক অবস্থান, প্রকৃতি ও ক্ষমতাবান মানুষের কাছে অসহায়ত্ব, নির্যাতিত জীবনে রূপসী স্ত্রী নিয়ে বিড়ম্বনা--এসবের চিত্র কবির বর্ণনায় খুব সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। কারণ চান্দ বিনোদের প্রাত্যহিক জীবন ধারা ও তার

সংগ্রামী জীবন কবির খুব কাছের বলেই এর চিত্ররূপ এমন অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে। প্রেমের ক্ষেত্রে চান্দ বিনোদ অক্ষম, দুর্বল ও ম্লান। মলুয়ার প্রতি প্রেমে তার নিষ্ঠার পরিচয় নেই। তার প্রেম যেন অনেকটা রূপজ মোহজাত। চারিত্রিক দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার অভাব ব্রাহ্মণ্য শাসনকে উপলক্ষ করে শেষ পর্যন্ত ট্রাজেডি সংঘটিত করেছে। চান্দ বিনোদ কাজীর অন্যায়, অত্যাচার, দেওয়ানের নির্যাতন, সমাজপতিদের অন্যায়-অবিচার--কোন কিছুর বিরুদ্ধেই প্রতিবাদী নয়, সমস্যা সমাধানে নয় সচেষ্ট। মলুয়াকে কাজীর লোকেরা ধরে নিয়ে যাবার খবর পেয়েও তাকে উদ্ধারের কোন চেষ্টা সে করে না। বরং অক্ষম পুরুষের মতো দেশান্তরী হয়। মলুয়ার প্রতি সমাজপতিদের অবিচার সে নীরবে কোন প্রতিবাদ না করেই মেনে নেয়, স্ত্রীকে ত্যাগ করে। মলুয়া দাসীবৃত্তি গ্রহণ করলেও তার মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব, যন্ত্রণা বা প্রতিবাদ দেখা যায় না বরং নিঃসংকোচে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করে। চান্দ বিনোদ তাই একটি নিষ্ক্রিয় অক্ষম চরিত্র। নায়কোচিত মর্যাদা রক্ষায় ব্যর্থ।

বস্তুত চান্দ বিনোদের চারিত্রিক এই দৌর্বল্য তার সামাজিক অবস্থানের প্রেক্ষাপটে নিহিত। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ক্ষমতাবান ব্যক্তির ষড়যন্ত্র, তাদের রক্তচক্ষুর নিপীড়নে ক্রমাগত নির্যাতিত চান্দ বিনোদ অসহায়, অর্থহীন, জনবলহীন। নিশ্চিত জীবনের সন্ধান পেয়েও বারংবার তা থেকে বিতাড়িত হয়েছে। হয়তো বা এ- কারণেই মলুয়ার জন্য নিজের সুখী নিশ্চিত জীবনে পুনরায় বিপর্যয় ডেকে আনতে চায় নি। প্রেমের জন্যও পারে নি ব্যক্তিস্বার্থকে বিসর্জন দিতে। শাশ্বত অসহায় দুর্বল পুরুষ সবলের ভয়ে মেনে নিয়েছে সব। ঐতিহ্যগত সংস্কারও কাজ করেছে এর পেছনে। চান্দ বিনোদ কিংবা চান্দ বিনোদের রচয়িতা সবার সামনেই দৃষ্টান্ত রয়েছে সীতা-সাবিত্রীর। সীতা রেহাই পায় নি সমাজের অনুশাসনের হাত থেকে, রামও পারে নি প্রতিবাদমুখর হতে। আমাদের ঐতিহ্যে প্রেমের ক্ষেত্রে নারী চিরকালই সীতার মতো ধৈর্যে, ত্যাগে, প্রেমের একনিষ্ঠায়, চারিত্রিক দৃঢ়তায়, সহিষ্ণুতায় উজ্জ্বল ও অনন্য হলেও পুরুষেরা চিরকালই সমাজসংস্কার শাস্ত্রের অনুশাসনের সামনে রামের মতোই প্রতিবাদহীন, নির্বিকার। চান্দ বিনোদ সেই ঐতিহ্যেরই সন্তান।

কঙ্ক একটি গুণবান সুন্দর চরিত্র। গীতিকার প্রায় সব পালাতেই নারী চরিত্রের তুলনায় পুরুষ চরিত্র অনুজ্জ্বল। কঙ্ক এদিক থেকে ব্যতিক্রম। ব্রাহ্মণ সন্তান কঙ্ক শৈশবে মাতৃ-পিতৃহীন হয়ে প্রথমে চণ্ডালগৃহে, পরে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের গৃহে আশ্রয় পায়। এই উন্মূল জীবনের প্রেক্ষাপটই তার ভবিষ্যৎ জীবনাচরণকে করেছে প্রভাবিত

ও নিয়ন্ত্রিত, ট্রাজেডি সংঘটিত হয়েছে এ পথেই। হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ-জ্ঞান নেই কঙ্কের। উদার প্রকৃতির বুদ্ধিমান যুবক সে। পণ্ডিত গর্গের গৃহে অবস্থানকালে মাঠে গরু চড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে চলে তার বিদ্যাশিক্ষা, মুখে মুখে শ্লোক শিক্ষা। মুসলমান পীরের কাছে দীক্ষালাভ করতেও সে দ্বিধাবোধ করে না। পীরের আদেশে *সত্যপীরের পাঁচালি* লিখে খ্যাতিলাভ করে সে।

পণ্ডিত-কন্যা লীলাকে কঙ্ক গভীরভাবে ভালোবাসে, কিন্তু লীলা গুরু-কন্যা, সহোদরার ন্যায়। অন্তরে ভালোবাসা গোপন রেখে কঙ্ক লীলার সঙ্গে দিন কাটায়। যখন শুনতে পায় সমাজ-শাস্ত্রে অনুমোদন নেই তাদের ভালোবাসার, পালক-পিতা গর্গ ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তখন ধীর শান্ত চিত্তে ঘর ছেড়ে চলে যায় কঙ্ক। গর্গের প্রতি এতটুকু রাগ বা অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে নি বরং লীলাকে পিতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও কর্তব্যপরায়ণ থাকতে বলে যায় সে। গর্গের আচরণকে সে সাময়িকভাবে ভ্রম বলে মেনে নেয়। নিজের হৃদয়ের কথা লীলাকে স্পষ্ট করে কিছুই বলে না। কারণ অনুচ্চারিত ভালোবাসার কথা পরস্পরের কাছে গোপন নেই। প্রাণে বেঁচে থাকলে আবারও দেখা হবে—শাশ্বত প্রেমিক চিত্তের এই বিশ্বাস। বিদায় বেলায় লীলার কাছে কঙ্কের প্রার্থনা: 'ঘরে আছে পোষারে পাখী হীরামন শারী/ তাহারে ডাকিও রে লীলা 'কঙ্ক' নাম ধরি।' এবং 'অভাগা বলিয়া কঙ্কে রাখিও স্মরণ'[২৫] কঙ্কের ভালোবাসা প্রকাশের সুযোগ আর হয় নি দীর্ঘদিন পর কঙ্ক ফিরে এসেছে কিন্তু লীলা তখন শ্মশানে। কঙ্কের ভালোবাসা হৃদয়ের আগুনে ও চিতার আগুনে এক হয়ে যায়। জীবনের শুরু থেকেই বন্ধনহীন কঙ্ক জীবনের শেষ পর্যন্তও গৃহহীন বন্ধনহীন থেকে যায়। 'পল্লীকবিগণ শৈশব হইতেই কঙ্ককে স্নেহ-ভালোবাসা, আশা-নৈরাশ্য ও প্রেম-বৈরাগ্য দিয়া গঠন করিয়াছিলেন। তাহাদের পরিকল্পনায় চরিত্রটির একটি সার্থক সুন্দর রূপ প্রকাশ পাইয়াছে'[২৬] সমালোচকের এ বক্তব্য মেনে নিয়েও বলা চলে, কঙ্ক চরিত্রটি উদার মহৎ সুন্দর হলেও প্রেমের ক্ষেত্রে কেমন যেন শান্ত, স্থির। প্রেমের জন্য তার মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব, যন্ত্রণা, উত্তেজনা ও অস্থিরতা লক্ষ্য করা যায় না। বরং এক ধরনের ধ্যানমগ্নতা, আধ্যাত্মিকতায় সৌম্য, শান্ত, সংযমী ও অবিচল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমৃদ্ধ কঙ্ক চরিত্রটি। প্রেমের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা তার চরিত্রে দেখা যায় না। তবু আশা-নৈরাশ্যে ভরা কঙ্ক চরিত্রটির রূপায়ণ অপূর্ব।

কঙ্ক চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে *দেওয়ানা মদিনা* পালার দুলালের জীবনের প্রারম্ভে। সৎমার ষড়যন্ত্রে মাতৃহীন দুলাল গৃহচ্যুত হলে এক সাধারণ গৃহস্থ ঘরে

আশ্রয় পায়। অতঃপর গৃহস্থ কন্যা মদিনাকে বিয়ে করে। অতিবাহিত হয় সুখী জীবন। কিন্তু আভিজাত্যের অহমিকায়, বড় ভাই আলালের যুক্তিতে নিরপরাধ স্ত্রীকে তালাক দেয় দুলাল, দেওয়ান–কন্যা বিয়ে করে দেওয়ান সেজে বসে। দুলাল চরিত্রটি ব্যক্তিত্বহীন, নৈরাশ্যবাদী চরিত্র। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সে অসহায়ভাবেই নিজেকে মানিয়ে নেয়। গৃহচ্যুত হয়ে সে গৃহস্থ কন্যাকে বিয়ে করে কৃষক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। আভিজাত্যের মোহ কাটিয়ে ভাইয়ের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে সে জীবনে টিকে থাকতে পারলে তার চরিত্রে গ্লানির ছাপ পড়তো না। কিন্তু তার চরিত্রে দৃঢ়তার অভাব ও ব্যক্তিত্বহীনতা সুস্পষ্ট। ভাইয়ের আহবানে আভিজ্যত্যের মোহে সে তার প্রেম, সুখী দাম্পত্য জীবন, পুত্রস্নেহ সবকিছুকে উপেক্ষা করে নির্মমভাবে চলে গেছে। এমনকি পরবর্তীতে সে নিজে পুত্র সুরুজ জামালকেও প্রত্যাখ্যান করেছে আভিজাত্য ও সামাজিক মর্যাদার অহংকারে। এদিক থেকে দুলাল সংকীর্ণ, হীন, অকৃতজ্ঞ, লোভী ও ব্যক্তিত্বহীন, নির্দয় পুরুষ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

কিন্তু দুলাল চরিত্রটি নির্দ্বন্দ্ব নয়। বরং এই দ্বন্দ্বময়তাই শেষ পর্যন্ত তাকে রক্ষা করেছে। গ্লানির বোঝা অনেকটা হ্রাস করেছে। আলালের প্রস্তাবে সে একেবারে বিনা দ্বিধায় রাজী হয় নি, বরং স্ত্রী–পুত্রের উল্লেখ করে তার অপারগতার কথা জানিয়েছে— 'মদিনা পরানের স্ত্রী তাহারে ছাড়িয়া/ কেমনে যাইবাম আমি অধর্ম করিয়া।'[২৭] আলালের যুক্তির কাছে তার এ দ্বিধা টেকে নি যদিও। বরং অভিজাত শ্রেণীর মোহ তাকে দ্বিধামুক্ত করেছে সহজেই। পরবর্তীতে পুত্রকে প্রত্যাখ্যান করেছে একই কারণে। কিন্তু তারপরই অনুশোচনা তাকে গ্রাস করেছে, মোহমুক্তি ঘটিয়েছে। হৃদয়ে জাগ্রত হয়েছে পুত্রস্নেহ, পত্নী প্রেম, কৃতজ্ঞতাবোধ। অনুশোচনার দাহ তাকে দেওয়ানগিরি ও নতুন স্ত্রীর বন্ধন মুক্ত করেছে। অন্তর্দ্বন্দ্বই তাকে মানবিক মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠায় উদ্দীপ্ত করেছে। সমালোচক তাই বলেছেন, দুলালের মনে একটি দ্বন্দ্বের বীজও কবি উপ্ত করেছেন। সে যুগে কাব্যে মানস দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণ দেখাবার কোন সুযোগ থাকলে দুলাল চরিত্রটি অতি উচ্চ ট্রাজিক গৌরবে মহিমান্বিত হতে পারতো। একদিকে মদিনার সঙ্গে তার আবাল্যবর্দ্ধিত প্রেম, অন্যদিকে তার নবলব্ধ সামাজিক মর্যাদা। সে দেওয়ান হয়ে সামান্য চাষী কন্যাকে কি করে স্বীকার করবে আপন পত্নী বলে? সুরুজ জামালকে ফিরিয়ে দিয়েছে, কিন্তু আপন হৃদয়দ্বন্দ্বের সমাধান করতে পারে নি। অন্তরের গভীরে সমাজ পার্থক্যকে সে স্বীকার করে নি। তাই যখন দেখি জীর্ণ বসনের মত দেওয়ানী

তক্তকে পদদলিত করে সে গ্রামের অভিমুখে চলেছে তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে হৃদয়ান্তরালে ক্রিয়াশীল মানসদ্বন্দ্বই শেষ পর্যন্ত তাকে এই পথে নিয়ে গেছে।'[২৮]

অন্তর্দ্বন্দ্ব সক্রিয় না হলে দুলাল বিনোদের মতোই প্রেমে নিষ্ঠাহীন রূপে চিহ্নিত থাকতো, বিনোদ সুখী জীবন থেকে চ্যুত হওয়ার আশঙ্কায় মলুয়ার প্রেমের মর্যাদা দেয় নি। আর দুলাল অভিজাত শ্রেণীর ঐশ্বর্যময় জীবনের মোহে ও একই শ্রেণীর স্ত্রী লাভের প্রত্যাশায় মদিনাকে উপেক্ষা করেছে। শেষ মুহূর্তে সে অনুতপ্ত হয়েছে, অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছে। চান্দ বিনোদের আর্তি (শেষ দৃশ্যে উচ্চারিত) ততোটা হৃদয়গ্রাহী না হলেও দুলালের অনুশোচনার যন্ত্রণা তাকে পাঠকের সমবেদনার কাছাকাছি নিয়ে আসে। নিজের সৃষ্ট আগুনে পুড়ে সে খাটি ও গ্লানিমুক্ত হয়েছে। তাতে আভিজাত্যের মিথ্যে অহংবোধের কাছে মানবতার জয়, মানুষের হৃদয়বৃত্তির জয় প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। কারণ 'বাহিরের ঐশ্বর্য ও আভিজাত্যবোধ কখনও অন্তর পূর্ণ করতে পারে না, অন্তর আর একটি অন্তরের জন্য সর্বদাই হাহাকার করিতে থাকে'[২৯]—মানব জীবনের এই সত্যটি দুলালের জীবনে বাস্তবে পরিণত। বস্তুত আভিজাত্য এমনি এক অন্ধত্ব, এক নিষ্ঠুর অভিমান ও মিথ্যে অহমিকা যা যুগে যুগে সাধারণ মানুষের জীবনকে, নারীর প্রেমকে লাঞ্ছিত করেছে, করেছে প্রবঞ্চিত। *মৈমনসিংহ গীতিকা*-র অধিকাংশ পালাতেই এদের প্রবঞ্চনা ও নির্যাতনের-কম বেশি পরিচয় বিধৃত।

২.৩

মৈমনসিংহ গীতিকা-র জনজীবনে নারীর ভূমিকা প্রধান। অধিকাংশ পালা নায়িকাকেন্দ্রিক। এখানে নায়িকারা প্রেমে পাতিব্রত্যে, ত্যাগে, ধৈর্যে, সহিষ্ণুতায়, সরলতায় চিরন্তন বাঙালি নারীর প্রতিনিধি। আলোচ্য চারটি পালার নায়িকারাও কবির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত জনজীবনের আওতাভুক্ত। গ্রামবাংলার ঘরে-ঘরেই এদের বাস। 'একমাত্র মহুয়া এই গাথা সাহিত্যে অতীব অভিনব সামগ্রী—ইহা ঘরের নহে, বাহিরেরও নহে।'[৩০] মলুয়া, লীলা ও মদিনা একেবারেই গ্রামবাংলার শাশ্বত বাঙালি নারীর স্বরূপে ও মহিমায় উজ্জ্বল।

মহুয়া ঘরের না হলেও আমদের সামাজেরই এক উন্মুল নারী চরিত্রের প্রতিনিধি। জন্ম তার সমতলের ব্যক্তিক জীবনের উঁচুতলায়, কিন্তু সে বেড়ে উঠেছে

গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের সান্নিধ্য ও সংস্পর্শে। তার জীবনে ব্রাহ্মণ-কন্যা ও বেদে-কন্যার সহজাত বৈশিষ্ট্য এবং প্রভাব বিদ্যমান। সংকটও এসেছে একই পথে। ব্রাহ্মণ-কন্যার ব্যক্তিক চেতনাজাত হৃদয়বৃত্তি বেদে-কন্যার গোষ্ঠীগত চেতনাজাত প্রভাবকে অস্বীকার করেছে। অস্বীকার করেছে পালক পিতা ও দলীয় সর্দারের নির্দেশ।

ব্যক্তিত্বে, সাহসিকতায়, কোমলতায়, বুদ্ধিমত্তায়, প্রণয়াকাঙ্ক্ষীর প্রতি বিশ্বস্ততায়, চারিত্রিক দৃঢ়তায় অনন্য মহুয়া সৌন্দর্যেও অতুলনীয়া। তার অপূর্ব সৌন্দর্যে অনেকেই উন্মত্ত, মুনি-সন্ন্যাসীও বিচলিত। তাদের লোভনীয় প্রস্তাব, ষড়যন্ত্র সবকিছু মহুয়া উপেক্ষা করেছে, অতিক্রম করেছে আপন সাহস, বুত্তিমত্তা ও প্রেমের দুর্জয় শক্তিতে। দৃঢ় মনোবল, উপস্থিত বুদ্ধিমত্তা ও কৌশল প্রয়োগ করে সে একের পর এক বিপদ অতিক্রম করেছে। কখনও ভেঙে পড়ে নি। প্রেমিকের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ কখনও দ্বিধান্বিত হয় নি, হয় নি বিচলিত, হতাশাগ্রস্ত। মহুয়ার এ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তার জীবনাচরণেই নিহিত। যাযাবরদের মধ্যে দুর্গম অরণ্যে বড় হয়েছে সে। প্রকৃতির কোমলতা ও কঠোরতা দ্বারাই সে লালিত। ব্রাহ্মণ-কন্যা হয়েও দেহসৌন্দর্য ও ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখিয়ে বেদে দলের মক্ষীরাণী ভূমিকায় অবতীর্ণ সে। চরিত্রের ভিতরে ও বাইরে যে সংগ্রাম যে দ্বন্দ্বমুখর গতি, তা তার উন্মুল জীবনের সঙ্গেই সম্পৃক্ত। মহুয়ার নিজের উক্তিতে তার স্বরূপ বিশ্লেষিত হয়েছে এভাবে--
'সুতের হেওলা অইয়া ভাইস্যা বেড়াই/ কপালে আছিল লিখন বাইদ্যার সঙ্গে ফিরি/ নিজের আগুনে আমি নিজে পুইর‍্যা মরি।'[৩১]

মুক্ত জীবন ও স্বাধীন প্রণয়ের প্রতি আকাঙক্ষায় ব্যাকুল মহুয়া বাঙালি নারীর ঐতিহ্য ও কুলমর্যাদা সম্পর্কেও সচেতন। নদের চাঁদের প্রেম সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে সে তার প্রেম প্রকাশ করে নি, নদের চাঁদের সঙ্গে গৃহত্যাগে রাজী হয় নি। বরং নিজের কষ্ট চেপে রেখে প্রণয়ীর মঙ্গল কামনা করেছে, তাকে গৃহে ফিরে যেতে পরামর্শ দিয়েছে, এমনকি হোমরা বেদে বামনকান্দা গ্রাম থেকে পলায়নের সিদ্ধান্ত নিলে মহুয়া 'আমি যে অবলা নারী আছে কুলমান'-এ কথা স্মরণ করে পিতার সঙ্গে চলে গিয়েছে। নির্জন বনে সামান্য ক'দিনের জন্য নদের চাঁদের সঙ্গে তার যে দাম্পত্য জীবনের চিত্র দেখানো হয়েছে তাতেও মহুয়ার চরিত্রে চিরন্তন বাঙালি নারীর বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। আসলে 'মহুয়া' চরিত্রধর্মে গীতিকার প্রেমময়ী নারীদেরই সগোত্র। কিন্তু ব্যক্তিত্বের বিকাশ তার চরিত্রে অনেকটা স্পষ্ট।

তার সক্রিয়তা ও বুদ্ধিবৃত্তি গীতিকার সব চরিত্রে মেলে না। তার রূপের উচ্ছ্বসিত মাদকতার সঙ্গে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও বিপদে অবিচল ধৈর্যের সহজ সম্মিলন ঘটেছে।'[৩২] কঠোর ও কোমল, সাহসী ও প্রেমময়ীর সমন্বয়ে গড়া চরিত্রের অধিকারী বলেই মহুয়া অনন্য, অসাধারণ, ঘরের হয়েও বাইরের।

দ্বন্দ্বমুখরতা মহুয়া চরিত্রের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ দ্বন্দ্ব বংশগত, পরিবেশগত, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যজাত। একদিকে সে ব্রাহ্মণ-কন্যা, অন্যদিকে বেদে-কন্যা। একদিকে কঠোর অন্যদিকে কোমল। প্রেমে একনিষ্ঠ, প্রণয়ীর প্রতি বিশ্বস্ত, আবার পালক পিতা হোমরার প্রতিও অকৃতজ্ঞ নয়। মুক্ত জীবনকাঙ্ক্ষা ও স্বাধীন প্রণয়ে বিশ্বাসী অথচ নারীর সহজাত বৈশিষ্ট্যমুক্ত নয়, কুলমর্যাদার প্রশ্নও আছে তার মনে। মহুয়ার প্রেমনিষ্ঠার পরিচয় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সর্বত্রই সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু প্রেমাস্পদের জন্য প্রেমের জন্য মহুয়া তার বেদে জীবন ও পালক পিতার কথা একেবারে উপেক্ষা করে নি। কাহিনীর প্রথম পর্যায়ে সে পিতা হোমরার সঙ্গে বামনকান্দা ছেড়ে এসেছে। পিতার প্রতি তার সহানুভূতি, ভালোবাসা, দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ একেবারে দুর্লক্ষ্য নয়। কিন্তু প্রেম তার কাছে সব কিছুর উর্ধ্বে স্থান পেয়েছে। কাহিনীর শেষ পর্যায়ে চরম দ্বন্দ্বময়তার প্রকাশ ঘটেছে। চরম সংকটের মোকাবেলা করতে হয়েছে মহুয়াকে। একদিকে পালক পিতার নির্দেশ, অন্যদিকে প্রেম ও প্রেমাস্পদের জীবন। অমীমাংসিত এ সমস্যার চরম দ্বান্দ্বিক মুহূর্তে মহুয়া তার সহজাত মানবিক গুণ থেকে দৃপ্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে--মৃত্যুকে বরণ করে নিয়ে সংকটের সমাধান করেছে। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তার ক্রোধ, ক্ষোভ ও প্রতিবাদ প্রতিফলিত হয়েছে। প্রেম ও প্রেমাস্পদের প্রতি তার নিষ্ঠা যেমন প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি পিতার প্রতি তার প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি, দায়িত্বও লক্ষণীয়। সংকট থেকে শুধু নিজেকে নয় পিতাকেও সে মুক্ত করেছে।

শেষ দৃশ্যে যে চরম দ্বন্দ্ব, মর্মস্পর্শী মুহূর্ত সেখানে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও মহুয়া নির্ভীক, তেজস্বী ও ভালোবাসার প্রকাশে অতুলনীয়া। দুলাল চরিত্রের মতো চান্দ বিনোদ প্রেমকে ধূলিলুণ্ঠিত করে নি সুখী ও নিরাপদ জীবনের প্রত্যাশায়। পিতৃনির্দেশ অমান্য করে আসন্ন মৃত্যু জেনেও দ্বিধাহীন কণ্ঠে উচ্চারণ করেছে--'তোমার সুজনে আমি না করবাম বিয়া', কারণ 'আমার বন্ধু চান্দ সুরুজ কাঞ্চা সোনা জ্বলে/ তাহার কাছে সুজন বাদ্যা জোনি যেমন জ্বলে।'[৩৩] মহুয়ার প্রেম নির্ভীক, আনন্দপূর্ণ। প্রেমের মুক্তাহার কণ্ঠে পরে মহুয়া চির বিজয়ী, মৃত্যুকে বরণ

করে হয়েছে মৃত্যুঞ্জয়ী।[৩৪] মহুয়ার জীবন নিয়তিলাঞ্ছিত। তার ভাসমান জীবন তীব্র গতিশীল, দ্বন্দ্বমুখর ও সংগ্রামী। এজন্য অন্যান্য নায়িকার সঙ্গে সে পুরোপুরি মিলে যায় না। কিন্তু প্রেমে, চারিত্রিক দৃঢ়তায় এবং একনিষ্ঠায় মহুয়া শাশ্বত বাঙালি নারীর মতোই। সব মিলিয়ে চরিত্রটি অত্যন্ত উজ্জ্বল ও জীবন্ত। মহুয়ার জীবনের করুণ পরিণতি বর্ণনায়, তার দুঃখ ও সংগ্রামমুখর জীবনের বর্ণনায় পল্লীকবি একাত্মবোধ করেছেন, দরদ ঢেলে দিয়েছেন। চরিত্রটি তাই বাস্তবতা জর্জিত অতিমানবীতে রূপান্তরিত হয় নি বরং প্রেমে, নারীধর্মে, বুদ্ধিমত্তায়, সাহসিকতায়, কঠোরতা ও কোমলতার সমন্বয়ে একান্তই মানবীয় হয়ে উঠেছে।

'মহুয়া চরিত্রের নির্ভীকতা, বুদ্ধিমত্তা, দৃঢ়তা, প্রণয়ে নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের মহিমার সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে মলুয়ার। স্বচ্ছল হিন্দু পরিবারের সুন্দরী কন্যা মলুয়া। পাঁচ ভাইয়ের আদুরে বোন। চান্দ বিনোদের স্ত্রী হওয়ার পর থেকে শুরু হয় মলুয়ার সংগ্রামী জীবন। সংঘাত ও সংগ্রামে ভরা তার বিবাহিত জীবন। স্বীয় সৌন্দর্যই তার জীবনে করুণ পরিণতি ডেকে আনে। স্বামী ও তার সংসারের প্রতি নিষ্ঠায় মলুয়া অনন্য। কোন প্রকার সংকীর্ণতা, ভীরুতা, দ্বিধাগ্রস্ততা তার চরিত্রকে ম্লান করে নি। শত দুঃখ-কষ্ট, অত্যাচার-অনাচার ও প্রলোভনেও তার দৃঢ়তা কমে নি। সুখী জীবনের প্রতিশ্রুতি ও প্রলোভনেও সে চান্দ বিনোদকে ভুলে যায় নি, ত্যাগ করে নি। গ্রাম বাংলার এক শাশ্বত সুন্দর রমণী মলুয়া।

'মলুয়া চরিত্রে রামায়ণের সীতা ও মনসামঙ্গলের বেহুলা চরিত্রের প্রভাব আছে। কিন্তু মলুয়া সীতা বেহুলার অনুকরণ মাত্র নয়।'[৩৫] মলুয়া মাটির স্পর্শে একান্ত উজ্জ্বল। পারলৌকিক কোন পুণ্যলাভের প্রত্যাশায় নয়, জীবনের আকাঙ্ক্ষাই তার মধ্যে প্রবলভাবে কাজ করেছে। ভালোবাসার অহমিকা নিয়েই সে সংগ্রাম করে গেছে লালসাকাতর পুরুষের ষড়যন্ত্র ও অনাচারের বিরুদ্ধে। শত অভাব ও দুঃখ দুর্দশা কোন কিছুতেই সে স্বামীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয় নি, স্বামীগৃহ ত্যাগ করে নি। আপন বুদ্ধিমত্তা, কৌশল প্রয়োগে মানসিক শক্তির দৃঢ়তায়, চান্দ বিনোদের প্রতি প্রেম-নিষ্ঠায় মলুয়া নিজেকে ও চান্দ বিনোদকে বার বার রক্ষা করেছে। কিন্তু সমাজপতিদের অবিচারে সে স্বামী কৃর্তক পরিত্যক্ত হয়েছে। তাতেও হতাশ না হয়ে
নিজ সংসারে দাসীবৃত্তি অবলম্বন করে টিকে থেকেছে। সর্পে দংশিত স্বামীর প্রাণ বাঁচিয়েছে। তবুও দাম্পত্য জীবন ফিরে পাবার সৌভাগ্য ঘটে নি, সমগ্র সমাজ রাজী হলেও পরিবর্তিত হয় নি সমাজপতিদের পূর্ব সিদ্ধান্ত। ব্রাহ্মণ্য সমাজের অনুশাসন

তখনও বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দাম্পত্য সুখের কামনায় একের পর এক সংগ্রাম করতে করতে ক্লান্ত, অত্যাচার-অবিচারে ক্ষতবিক্ষত মলুয়া কিছুতেই যখন সমাজের সেই অনতিক্রম্য অনুশাসনকে লঙ্ঘন করতে পারে নি তখন আত্মবিসর্জনের পথ বেছে নিয়েছে—'ভাবিয়া চিন্তিয়া মলুয়া না দেখে উপায়/ আপনি থাকিতে নাহি স্বামীর দুঃখ যায়/ বদনাম কলঙ্ক যত না যাইব সোয়ামীর/ পরান ত্যাজিবে কন্যা মনে কৈল স্থির।'[৩৬] অভিমানে ও প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদে মলুয়া মৃত্যুকে বরণ করে নেয়। তার এ-অভিমান ও প্রতিবাদ শুধু সমাজের বিরুদ্ধে নয়, অক্ষম স্বামী বিনোদের বিরুদ্ধেও। বিনোদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ সে উচ্চারণ করে নি সত্য বরং জ্ঞাতি বন্ধু জনে ডেকে বলে গেছে-'কোন দোষের দোষী নয় আমার সোয়ামী।'[৩৭] তবু এ উক্তির মধ্য দিয়েই চান্দ বিনোদের চরিত্রের দৌর্বল্য, মলুয়ার প্রতি তার দায়িত্বহীনতার কথাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চারিত্রিক দৃঢ়তায়, প্রখর বুদ্ধিমত্তায় জীবনাকাঙ্ক্ষায়, সংগ্রামে মলুয়া অতুলনীয়া। 'মুলুয়া পালাটির নায়িকা চরিত্রের মধ্যে একটি তেজোদীপ্ত প্রখর ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে...।'[৩৮] এই ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটেছে তার আত্মবিসর্জনের সিদ্ধান্তে। যে চান্দ বিনোদের জন্য, যে দাম্পত্য জীবনের জন্য সে এত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছে, এত সংগ্রাম, বুদ্ধি ও কৌশলের মাধ্যমে নিজে বিপদ অতিক্রম করেছে, চান্দ বিনোদকে রক্ষা করেছে-সেই চান্দ বিনোদ সমাজের অনুশাসন মেনে নিয়েছে নির্বিবাদে। এমনকি মলুয়া দাসীবৃত্তি অবলম্বন করে চান্দ বিনোদকে সর্প দংশনে আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করলে, তখনও চান্দ বিনোদ সমাজের অনুশাসনকে উপেক্ষা করে, মলুয়াকে ঘরে তুলতে সাহসী হয় না—এ অপমান, এ অবমাননা, ও ভীরুতাকে ধিক্কার দিয়েছে মলুয়া।

কঙ্ক ও লীলা-র নায়িকা লীলা এবং *দেওয়ানা মদিনা-র* নায়িকা মদিনার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং পরিণতি প্রায় অভিন্ন। লীলার প্রেম বিবাহ-পূর্ব, মদিনার বিবাহোত্তর। দু'জনেই প্রেমাস্পদের জন্য প্রতীক্ষায় থেকে তিলে তিলে মৃত্যুকে বরণ করেছে বিনা প্রতিবাদে। এক আশ্চর্য সরলতা লক্ষ্য করা যায় দুটি চরিত্রেই। দু'জনের প্রেমাস্পদই ফিরে এসেছে তবে তাদের মৃত্যুর পরে।

ব্রাহ্মণ- কন্যা লীলা শৈশবে মাতৃহারা। তাই পিতৃমাতৃহীন কঙ্কের দুঃখ সে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করে। কঙ্ককে সে ভালবাসে। তার এ- ভালবাসা নিষ্কলুষ। সরলতার প্রতিমূর্তি লীলা পিতার ষড়যন্ত্রের কথা কঙ্ককে গোপন করে না। কঙ্কের

বিরহে সে জীবন ত্যাগ করে। লীলা একজন অসহায় বাঙালি নারীর প্রতিচ্ছবি। তার মধ্যে কোন সাহসিকতা নেই, বিপদ মুক্তির প্রচেষ্টা নেই বরং আছে প্রণয়ে একনিষ্ঠা, প্রণয়ীর কল্যাণ কামনা ও আন্তরিকতার সহজ সরল প্রকাশ। নারী হৃদয়ের সহজ সরল মানবিক অনুভূতিতে চরিত্রটি উজ্জ্বল। সবকিছু নীরবে মেনে নেয়াই এ-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

সহজ সরল মদিনা সাধারণ কৃষক কন্যা, পরবর্তীতে কৃষক-স্ত্রী। কৃষক-স্বামী যখন অভিজাত দেওয়ান হলো তখনই এলো তার জীবনে ট্রাজিক পরিণতি। ত্যাগে মহিমায় উজ্জ্বল চিরন্তন বাঙালি গৃহবধূ মদিনা। কৃষি ভিত্তিক দাম্পত্য জীবনে সুখ-দুঃখের প্রতীক। কৃষিজীবনের গার্হস্থ্য পটভূমিতেই মদিনার প্রেম বিকশিত। স্বামীর প্রতি বিশ্বাসে সে অবিচল। তালাকনামা হাতে পেয়েও সে বিশ্বাস করতে পারে নি স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছে। বরং প্রতীক্ষায় থেকেছে দিনের পর দিন সরল বিশ্বাস নিয়ে। স্বামীর প্রতি তার বিশ্বাসের মূলে রয়েছে গভীর প্রেম। কিন্তু পুত্র সুরুজ জামাল যখন অভিজাত পিতার দুয়ার থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে আসে, তখন তার বিশ্বাস ভাঙে। তবুও দুলালের প্রতি কোনরূপ অভিযোগ সে করে না--রং পুরানো দিনের সুখময় স্মৃতিচারণে তার দিন কাটে। সরলা মদিনা বুঝতে পারে না দুলাল কী করে তাকে ভুলে আছে। বিশ্বাস ও আশাভঙ্গের যন্ত্রণা মদিনাকে এত বেশী আঘাত দেয় যে, মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে সে। মদিনা শাশ্বত বাংলার সেই ধরনের নারী--প্রতিবাদ করার ভাষা যাদের জানা নেই, সংযম ও সহিষ্ণুতাই যাদের একমাত্র অবলম্বন। বস্তুত মদিনা চরিত্রটি গ্রামীণ জীবনের পটভূমিতে, সহনশীলতায় ও আত্মত্যাগে অপূর্ব হয়ে উঠেছে। সমালোচক তাই যথার্থই বলেছেন, 'মদিনার চরিত্র-চিত্রণে যে অপূর্ব গ্রাম্যশ্রী ও শিল্প-নৈপুণ্য প্রদর্শিত হয়েছে, তা কোন কৃষক কবির নিকট হতে আমি প্রত্যাশা করি নি।'[৩৯]

২.৪

মৈমনসিংহ গীতিকা-র পালায় নায়ক-নায়িকা ছাড়া অন্যান্য প্রধান-অপ্রধান চরিত্র ও সমকালীন জনজীবনের পরিচয় তুলে ধরেছে। তাই এদের গুরুত্বও কম নয়। অনেক প্রধান চরিত্রই নায়ক- নায়িকার জীবনকে করেছে নিয়ন্ত্রিত। *মহুয়া* পালার হোমরা বেদে এমন একটি চরিত্র। হোমরা নায়ক না হলেও একটি প্রধান চরিত্র। সে বেদে দলের সর্দার, মাঝে মধ্যে ডাকাতিও করে। তার আচরণ স্বীয় পেশার সাথে সম্পর্কিত। নিজের সামজিক অবস্থান ও পেশাগত কারণেই সে রূঢ়, কঠোর,

অনুভূতিহীন এবং নির্দয়। দৃঢ়তা, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণক্ষমতা, অবিচলতা—এগুলো তার চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। গোষ্ঠীগত জীবনে যে ব্যক্তি হৃদয়ের অনুভূতিকে প্রাধান্য দেয় না, তার মূল্য দিতে জানে না। ব্যবসায়িক স্বার্থ, পেশাগত এবং গোষ্ঠীগত জীবনের প্রয়োজনই তার কাছে বড়। সর্দার হোমরার কাছে তাই ব্যক্তি হোমরার হৃদয়ের আবেগ ও স্নেহের উত্তাপ প্রচ্ছন্ন থাকে। পালক পিতা হোমরা তাই সর্দার হোমরার কঠোরতার আবরণে ঢাকা পড়ে যায়।

মহুয়া-নদের চাঁদের প্রেমের ক্ষেত্রে হোমরা তীব্রভাবে বিরোধিতা করে শুরু থেকেই। মহুয়াকে নিয়ে পলায়ন, নদের চাঁদকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার চেষ্টা, এবং শেষ দৃশ্যে নিষ্ঠুরভাবে মহুয়ার হাতে বিষলক্ষের ছুরি তুলে দেয়া—সবই তার কঠোর ও অবিচল হৃদয়ের পরিচায়ক।

কিন্তু হোমরা বেদের কঠোরতা, রূঢ়তা, নিষ্ঠুরতা তার চরিত্রের এক দিক। অপর দিকে রয়েছে স্নেহ, মায়া-মমতা, পিতৃত্ব। যে দিকটি কাহিনীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নেতা ও সর্দার হোমরার কঠোরতার বহিরাবরণে ঢাকা ছিল। একেবারে শেষ দৃশ্যে মহুয়ার আত্মত্যাগের পর হঠাৎ করেই বাধভাঙা আবেগে তা উন্মোচিত হয়েছে। মহুয়া ও নদের চাঁদের প্রেমের কাছে সর্দার হোমরার অহমিকা ভেঙে পড়েছে, জেগে উঠেছে পিতৃত্ব। পরাজিত হয় সর্দার হোমরা, জয়ী হয় পিতা হোমরা। সন্তানহীন হোমরার অন্তরে এক অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ পিতার অস্তিত্ব আমরা লক্ষ্য করি। পরাজিত সৈনিকের ন্যায় অনুশোচনায় দগ্ধ অসহায় হোমরার কণ্ঠে ঝরে পড়ে এক ধরনের বৈরাগ্য—'আর না ফিরিব আমি আপনার ভুবনে/ তোমরা সবে ঘরে যাও আমি যাইবাম বনে।'[৪০] হোমরার এ এক নতুন রূপ। তার সমস্ত স্বার্থবুদ্ধি লোপ পেয়ে একমাত্র পিতৃস্নেহই বড় হয়ে উঠেছে। কারণ মানুষ তার স্বীয় আর্দশ বা স্বার্থ রক্ষার্থে দীর্ঘ সংগ্রাম শেষে যখন সবকিছু হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে যায়, তখন সে অকপটে নিজের কাছে ধরা দেয়। কোন কিছু তখন আর বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। এ প্রসঙ্গে আমরা বিসর্জন নাটকের রঘুপতি চরিত্রের কথা স্মরণ করতে পারি। হোমরা গোষ্ঠীগত চেতনা ও গাষ্ঠী স্বার্থে নেতৃত্বের মোহে আপন অন্তরে পিতৃত্বের অস্তিত্ব অস্বীকার করলেও সবকিছু হারিয়ে সেই কোমল স্থানটি অনাবৃত হয়ে গেছে। আর কোন বাধ মানে নি। তার এই অনুতাপ ও অনুশোচনায় কাতর পিতৃহৃদয় চরিত্রটিতে ব্যতিক্রমী সুর ধ্বনিত করেছে, মানবীয় করে তুলেছে। তা না হলে সে নিষ্ঠুরতা ও কঠোরতার প্রতীক হয়েই থাকতো দর্শক শ্রোতার সীমাহীন ঘৃণা নিয়ে।

কিন্তু শেষ দৃশ্যে নেতৃত্ব ও পিতৃত্ব সবকিছু হারিয়ে হোমরা যখন সম্পূর্ণ নিঃস্ব ও অসহায় এক মানুষে রূপান্তরিত ও অনুশোচনায় দগ্ধ তখন হোমরার প্রতি বিরূপ বিক্ষুব্ধ দর্শক-শ্রোতা তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। সমস্ত পালায় তার প্রতি বিদ্বিষ্ট পাঠকের সমস্ত সহানুভূতি কেন্দ্রীভূত হয় তার উপর, কারণ সব হারিয়ে সে তখন নিঃস্ব, অসহায় এক মানুষ--অনুতাপ ও অনুশোচনার যন্ত্রণা যার বাকী জীবনের সম্বল বস্তুত হোমরা বেদের পরিবেশ, তার সামাজিক অবস্থান ও জীবনাযাত্রার প্রেক্ষাপটে তার চরিত্রায়ণ বাস্তবসম্মত। কারণ দলীয় সর্দার স্বভাবতঃই কঠোর, রূঢ়, নিজের সিদ্ধান্তে ও দলীয় স্বার্থে অটল এবং ব্যক্তিক অনুভূতিকে পরিহার করে চলবে এটাই স্বাভাবিক। গীতিকার মূল বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে এখানে শেষ পর্যন্ত সবকিছুর উর্ধ্বে মানবীয় আবেগ ও মূল্যবোধেরই জয় ঘোষিত হয়েছে। কারণ ধর্ম-শাস্ত্র-সমাজ-সংসার-নীতি আদর্শ সবকিছুর উর্ধ্বে হলো মানুষের মানবতাবোধ, মানবিক আবেগ ও অনুভতি--এ সত্যটি গীতিকার কবিগণ কখনও ভুলে যান নি।

মলুয়া পালার কাজী নারীলিপ্সু ক্ষমতাবান পুরুষ। দেওয়ানও এমন একটি চরিত্র। তবে এ পালায় দেওয়ানের চেয়ে কাজীর অত্যাচার ছিল বেশি। কাজী ও দেওয়ান চরিত্র সমকালীন মুসলিম শাসনের রূপকে তুলে ধরেছে। মধ্যযুগে সামন্ত শাসকের প্রতীক এ-চরিত্র দুটো। সামন্ত যুগে শাসকবর্গের চারিত্রিক অবক্ষয়ের প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র এই কাজী ও দেওয়ান। যারা যুগে যুগে ক্ষমতার অপব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে করেছে বিপর্যস্ত, নির্যাতিত। নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে যে কোন ঘৃণ্য পথ অবলম্বন করে ষড়যন্ত্র করতে কুণ্ঠিত নয় তারা। বস্তুত কাজী চরিত্রটি শঠতা, নিষ্ঠুরতা, লাম্পট্য ও যৌন-উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতীক।

কঙ্ক ও লীলা-য় গর্গ একটি প্রধান চরিত্র। দ্বন্দ্বমুখরতা চরিত্রটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য। গর্গ দয়ালু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। পাণ্ডিত্যের অহমিকা তার নেই। সহজ মানবীয় আবেগে চণ্ডাল শিশুকে শ্মশান থেকে ঘরে এনে পুত্রবৎ স্নেহ করেন। পরবর্তীতে তাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যও উদ্যোগ গ্রহণ করেন কিন্তু সমাজপতিদের ঘৃণ্য রটনায় বিভ্রান্তিও দেখা দেয় দ্রুত। কঙ্কও লীলার প্রতি অবিচার করে। মানবিক আবেগ-তাড়িত চরিত্র গর্গ। ভালো মানুষ হলেও আবেগের দৌর্বল্যই তার নিজের জীবনে এবং কঙ্ক ও লীলার জীবনে ট্রাজেডি ডেকে এনেছে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গর্গ তার সংকীর্ণতাজনিত বিভ্রান্তির জন্য মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। অনুশোচনা ও

যন্ত্রণাকাতর গর্গ শেষ পর্যন্ত ধর্মচিন্তামুক্ত মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন এক অসহায় ব্যক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। মানবীয় উপলব্ধি সমৃদ্ধ এক মহৎ মানুষ গর্গ চরিত্রটি করুণ অথচ সুন্দর।

দেওয়ানা মদিনা পালার আলাল একটি প্রধান চরিত্র। আলালের সক্রিয়তা তাকে নায়কোচিত মর্যাদার কাছাকাছি নিয়ে গেছে। বুদ্ধিমত্তা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, দূরদর্শিতা তার জীবননাট্যের গতি পরিবর্তন করেছে। সৎমায়ের ষড়যন্ত্রের পরিণতিতে প্রাণে বেঁচে গেলে সে দুলালের মত পরিবর্তিত পরিস্থিতিকে মেনে নিয়ে তাতেই অভ্যস্ত হয়ে ওঠে নি। বরং বিমাতার ষড়যন্ত্রের প্রতিশোধ, পিতার রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য দৃঢ়সংকল্প হয় এবং তা বাস্তবায়নের জন্য দূরদর্শী পরিকল্পনা গ্রহণ করে। দেওয়ানের উপযুক্ত জ্যেষ্ঠ সন্তান সে। সে দক্ষ কূটনীতিক ও যোদ্ধা। রাজ্যজয়ের পর ছোট ভাই দুলালকেও সে খুঁজে বের করে এবং দেওয়ানীর অংশীদার করে। দুলালকে তার কৃষক-জীবন ও স্ত্রী-পুত্রের কাছ থেকে নিয়ে আসার পেছনে তার আভিজাত্যের অহংবোধ ও সংস্কারই কাজ করেছে। এ ছাড়া আর কোন সংকীর্ণতা বা স্বার্থপরতা তার চরিত্রে নেই। তবুও আলাল চরিত্রটি উজ্জ্বল হতে পারে নি। তার চরিত্রে কোন দ্বন্দ্ব নেই, দ্বিধা নেই—আপন লক্ষ্যে সে অবিচল, আবেগহীন।

হোমরা বেদের মত কঠোর নির্দয় চরিত্র, কাজীর মত লম্পট নারীলোলুপ, গর্গের মত সহজ সরল পণ্ডিত, আলালের মত অভিজাত শ্রেণীর চরিত্র—সমাজের ভিন্ন অবস্থানে থেকে নিজেদের প্রেক্ষাপটেই চিত্রিত হয়েছে কাহিনীর প্রয়োজনে। এরা সবাই পল্লীকবির অভিজ্ঞতাপ্রসূত জনজীবনের কাছের ও দূরের পাত্র-পাত্রী। এরা ছাড়াও বিভিন্ন পালার অপ্রধান চরিত্রগুলো চিত্রণেও কবির বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞতার পরিচয় সুস্পষ্ট। সমাজে ও জীবনে বিচিত্র মানুষের আনাগোনা। এরাও সামান্য পরিসরে নিজেদের ভূমিকায় উজ্জ্বল। গীতিকায় চিত্রিত জনজীবনের এক বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে এসব চরিত্র। এদের ভূমিকা অপ্রধান হলেও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

মহুয়া পালায় হোমরা বেদের পাশে মানিক অপ্রধান অনুজ্জ্বল চরিত্র। এ-চরিত্রের কোন বিকাশ নেই। মানিকের মধ্যে অরণ্যভূমির গোষ্ঠীবদ্ধ যাযাবর জীবনের পরিবর্তে সমতলের সুখী নিশ্চিত জীবনের প্রতি একটা আকর্ষণ লক্ষ্য করা

যায়। তাই সে বামনকান্দা গ্রামের নতুন বসতবাটি ছেড়ে যেতে চায় না। এটা মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য। সুজন চরিত্রেরও তেমন কোন ভূমিকা নেই। সুজন ভালো খেলোয়াড়। হোমরা মহুয়াকে তার কাছে বিয়ে দিতে চেয়েছে। হোমরার পরবর্তী দলীয় নেতা হয়তো সুজনকেই করা হতো। লেংরা চরিত্রটিও তার ভূমিকায় স্বাভাবিক।

পালং সখী চরিত্রটি স্বল্প পরিসরে সুন্দর একটি চরিত্র। বন্ধুত্বের মহিমায় উজ্জ্বল। মহুয়ার মতই হয়তো কোন ছিন্নমূল নারী। সেও বেদে দলের অন্তর্ভুক্ত। মহুয়ার সুখ-দুঃখের ভাগী। জীবন-মৃত্যুর সাথী। মহুয়া-নদের চাঁদের প্রেমে সাফল্যের জন্য সে হোমরার বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে সচেষ্ট থেকেছে। বন্ধুত্বের জন্য আত্মনিবেদিত প্রাণ পালং সই বুদ্ধিমত্তারও পরিচয় দিয়েছে। গভীর বনে পালং সখীই মহুয়া-নদের চাঁদকে বাঁশির সুরে হোমরার আগমন সংবাদ পৌঁছে দেয়, তাদেরকে সতর্ক হওয়ার সংকেত দেয়। স্বল্প পরিসরে চরিত্রটি মহৎ ও উজ্জ্বল। আশুতোষ ভট্টাচার্য এ-চরিত্র সম্পর্কে বলেছেন, '...পালঙ সই বাহিরে ক্ষুদ্র হইয়াও অন্তরে মহৎ। জীবনে সুখ-দুঃখের ভাগিনী সখীর জন্য সে আত্মোৎসর্গ করিয়া তাহার অন্তরের অসীম মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছে।'[৪১]

নদের চাঁদের মা জমিদার-গিন্নী। আচার-আচরণে, আবেগে-অনুভূতিতে চিরন্তন বাঙালি মা। মলুয়ার মাতা, চান্দ বিনোদের মা, আলাল-দুলালের মা-ও বাঙালি মায়ের বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। সন্তানের মঙ্গল-অমঙ্গল বিবেচনায় আবেগ-অনুভূতিতে সব বাঙালি মা একই রকম। চান্দ বিনোদের বোন, মলুয়ার ভাই, ভাইয়ের বৌ, পাড়া-পড়শী, খুড়ী, জেঠী, মাসী, পিসী—এরা আমাদের সমাজেরই চারপাশের মানুষ।

নারী সব সময়েই পুরুষের লালসার শিকার—তা কাজী-দেওয়ান-সাধু-সন্ন্যাসী যে-ই হোক না কেন! সাধু সন্ন্যাসী চরিত্রও অসহায় নারীর রূপে আকৃষ্ট হয়ে যেভাবে প্রেম ভিক্ষা করেছে, তাতে চিরকালীন নারীলোলুপতাই প্রাধান্য পেয়েছে। মহুয়া মলুয়া পুরুষের লালসার বাস্তব শিকার।

নেতাই কুটনী চরিত্রটি বিশেষত্বের দাবী রাখে। গ্রামীণ জীবনে এ ধরনের চরিত্র সব সময়েই দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর বড়াই, বঙ্কিমচন্দ্রের

হিরামালিনীকে আমরা এ-প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারি। গ্রামীণ সমাজজীবনের কাঠামোতে এ-ধরনের চরিত্রচিত্রণ বাস্তবসম্মত হয়েছে।

চান্দ বিনোদের মামা, পিসা, *কঙ্ক ও লীলা* পালার ব্রাহ্মণ—এ জাতীয় চরিত্র স্বল্প পরিসরে অসাধারণ ভূমিকা রাখে। এরা সমাজে একদিক থেকে ক্ষমতাবান এবং সে ক্ষমতার জোরে তারা মানুষকে চরমভাবে নিপীড়ন করে থাকে। সে পীড়ন শারীরিক নয়, মানসিক। জাতি-ধর্মের প্রশ্ন তুলে সামাজিক বিচার আচারের রায় দেয় তারা। সে রায় প্রায়শঃই অপরিবর্তিত। এ জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই হলো শাস্ত্র সংস্কার ও নীতির যাঁতাকলে সাধারণ মানুষের জীবনকে পিষ্ট করা। যদিও মূলত সমাজ ও তার মানুষের মঙ্গলের জন্য তাদের কোন রকম ভূমিকা থাকে না কখনই। এরা মানুষের বিপদে সাহায্য করতে আসে না, কিন্তু শাস্ত্র বিধি নিয়ে ফতোয়া জারি করে মানুষের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলতে পিছপা হয় না। প্রয়োজনে মিথ্যে কুৎসা রটনা করতেও এরা দ্বিধাবোধ করে না—তার প্রমাণ আমরা *কঙ্ক ও লীলা* পালাতে ব্রাহ্মণদের আচরণে দেখেছি।

দেওয়ানা মদিনা পালার সতীন এবং জল্লাদ চরিত্র দুটি নিষ্ঠুরতার প্রতীক। নারী সাধারণত স্নেহ-মমতা ও প্রেমের ধারক। কিন্তু দুলালের সৎমা চরিত্রটি তার ব্যতিক্রম দিকটির প্রতিনিধিত্ব করেছে। সংসার জীবনে বিকল্প আসনে দ্বিতীয় স্ত্রী বা সৎমায়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ, নারী-পুরুষের পূর্বস্মৃতি বা স্মৃতিচিহ্নকে সহজে মেনে নিতে পারে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বভাব-সুলভ কোমলতা ও মায়া-মমতাকে বিসর্জন দিয়ে নারী হয়ে ওঠে রূঢ়, সন্দেহ-পরায়ণ, ঈর্ষাতুর, হিংস্র ও নিষ্ঠুর। নারীর এই ব্যতিক্রমী রূপটির প্রতিফলন ঘটেছে দুলালের সৎমা চরিত্রে। আপন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সে নিপুণ অভিনয়, ছল-চাতুরী, বুদ্ধি কৌশল, ষড়যন্ত্র ও প্রলোভনের বিচিত্র পথ অবলম্বন করেছে। কবি আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে চরিত্রটি অংকন করেছেন। জল্লাদ চরিত্রটিও তার পেশাগত অবস্থান থেকে নিষ্ঠুর ও স্বার্থান্ধ। বিশ পুরা জমির প্রলোভনে সে সৎমার সহযোগিতা করেছে।

সৎমা, জল্লাদ, কাজী, সাধু, সন্ন্যাসী, নেতাই কুটনী এসব চরিত্র সৎগুণে গুনান্বিত নয় সত্য, কিন্তু তাই বলে অবাস্তবও নয়। কারণ এদের আচরণ রক্তমাংসময় মানুষেরই প্রবৃত্তিজাত। এদের চরিত্রে যে হিংস্রতা, নিষ্ঠুরতা, অমানবিক নীচতা ও স্বার্থপরতা প্রকাশ পেয়েছে তা অলৌকিক কোন জগতের নয়--

সমাজভুক্ত মানুষের। হয়তো কবির বর্ণনায় বাহুল্য থাকতে পারে, কল্পনার মিশ্রণ থাকতে পাবে। কিন্তু এ জাতীয় চরিত্র সমাজজীবনে বিরল নয়। স্বার্থের প্রশ্নে মানুষ অনেক সময় নির্দয়, নিষ্ঠুর ও আবেগশূন্য হয়—এসব চরিত্রে তারই প্রতিফলন ঘটেছে। চরিত্রগুলো অমার্জিত, অমানবিক, কিন্তু বাস্তব।

দেওয়ান সোনাফরের চরিত্রটি পত্নীপ্রেমের গভীরতায়, সন্তানের প্রতি স্নেহে, সততা ও নিষ্ঠায় একটি অপূর্ব সুন্দর চরিত্র। স্বল্প পরিসরে চরিত্রটি উজ্জ্বল। সরলতাও চরিত্রটির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

মলুয়ার বাবা হীরাধর মোড়ল এবং দেওয়ান সেকান্দরের চরিত্রে কন্যার জনক হিসেবে একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় যা বাঙালি পিতার শাশ্বত পরিচয়ই বহন করে। হীরাধর মলুয়ার বিয়ে প্রসঙ্গে পাত্র পছন্দ করে বংশমর্যাদা, অর্থসম্পদ ইত্যাদি বিচার পূর্বক। এমন কি 'রোগীর বংশ' বলে বিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছে। তেমনি দেওয়ান সেকান্দরও সুন্দর কর্মঠ তরুণ যুবক আলালের ব্যবহারে মুগ্ধ, মনে মনে আত্মীয়তা করতে আগ্রহী। কিন্তু 'গৃহস্থ-পুত্র' আলালের কাছে নিশ্চয়ই নয়। এ কারণেই আলাল নিজেকে গৃহস্থ-পুত্র বলে পরিচয় দিলেও তার মন তা বিশ্বাস করে না। শেষে আলাল দেওয়ন পুত্র জেনে সানন্দে মেয়ে বিয়ে দেন। এ সমস্ত চরিত্র ছাড়াও আরও কিছু চরিত্র কাহিনীর প্রয়োজনে চার পাশে এসেছে। দেওয়ান স্ত্রী, উজির নাজির, হীরাধর বেপারি, রাখাল শ্রেণী, বিচিত্র মাধব, মুরারী চণ্ডাল, চন্ডগুল-স্ত্রী, মদিনার ভাই, মাঝি-মাল্লা, দাসী-বাঁদী এরাও সমাজ-অন্তর্গত জনজীবনের একাংশ।

বস্তত গীতিকার বিভিন্ন পালায় চিত্রিত জনজীবনের যে পরিচয় বিধৃত তা গ্রামীণ সমাজজীবনের বিভিন্ন স্তরের মানুষের। আর তাদের চরিত্রায়ণে সমকালীন সমাজজীবন ও জনমানসেরই বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে। পালাকারদের অসাধারণ পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে এ-সমস্ত চরিত্র চিত্রণে।

২.৫

লক্ষণীয় যে পুরুষ চরিত্রের তুলনায় নারী চরিত্রের প্রতি কবির আকর্ষণ ও সহানুভূতি বেশি। প্রায় প্রতিটি পালাই নায়িকা প্রধান এবং তাদের চরিত্রই বেশি প্রাণবন্ত ও উজ্জ্বল। সমালোচক যথার্থই মন্তব্য করেছেন, 'এই পালাগানের নায়িকাগুলির চরিত্র

পাঠ করে মনে হচ্ছে যেন অজন্তা গুহার চিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে আমার চক্ষের সম্মুখে দাঁড়িয়েছে। ইহাদের লীলায়িত ভঙ্গি ও লাস্যের মনোহারিত্ব আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে।'[৪২] প্রণয়ে একনিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততা ছাড়াও শত অত্যাচার ও প্রতিকূল অবস্থাতেও অবিচল থাকার দৃঢ়তা, সাহসিকতা, বুদ্ধিমত্তা ও আত্মত্যাগে গীতিকার নারী চরিত্রে যে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটেছে, জীবনতৃষ্ণার যে ব্যাকুল উদ্দীপনাময় প্রচেষ্টা রয়েছে তা অধিকাংশ পুরুষ চরিত্রেই নেই। নারীর শক্তি তার প্রেমে, তার নারীধর্মের গৌরবে। সে তুলনায় পুরুষ চরিত্র অনেক নিষ্প্রভ। নারীর দুঃখ বেদনা ও ত্যাগের সঙ্গেই কবি অন্তরঙ্গ হয়েছেন বেশি। তবে পুরুষ চরিত্র চিত্রণেও কবি অমনোযোগ বা প্রতিকূল মনোভাব প্রকাশ করেন নি। নারীর দুঃখ-বেদনার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়েছেন সত্যি, কিন্তু তাই বলে কোন পক্ষপাত অবলম্বন করেন নি।

বিশেষ করে অপ্রধান চরিত্রের বেলায় নারী-পুরুষ সবাই সমান গুরুত্ব পেয়েছে। কাজী, নেতাই কুটনী, সৎমা, জল্লাদের মতো অমার্জিত চরিত্রগুলো সমান গুরুত্ব নিয়ে চিত্রিত। বস্তুত প্রতিটি চরিত্রই নিজ নিজ সমাজিক অবস্থান ও প্রেক্ষাপটে থেকে বাস্তবসম্মতভাবে চিত্রিত হয়েছে। কোন রকম অলৌকিকতা বা অতিমানবীয়তা প্রয়োগে চরিত্রগুলোকে অবাস্তব করে তোলা হয় নি। জীবন-তৃষ্ণা ও জীবনাকাঙ্ক্ষার ব্যাকুলতা প্রতিটি চরিত্রের বিশেষত্ব।

সমাজের উঁচু শ্রেণীর বা অভিজাত শ্রেণীর চরিত্র চিত্রণে কবিদের তিক্ততাপূর্ণ অভিজ্ঞতার প্রকাশ ঘটেছে প্রায় ক্ষেত্রেই। অভিজাত শ্রেণীর মানুষ এখানে খেয়ালী, অত্যাচারী, অহংকারী নারীলিপ্সু রূপেই চিত্রিত এবং পুরুষশাসিত সমাজে স্বভাবতঃই তারা পুরুষ আর তাদের খেয়ালীপনা, অত্যাচার ও লালসার শিকার নারী। প্রায় ক্ষেত্রেই অভিজাত শ্রেণীর চরিত্র চিত্রণ ও জীবনাচরণের বর্ণনা অনেকটা কষ্টকল্পিত। তাদের জীবনের বহিরাবরণই কবির কাছে প্রত্যক্ষ, মনোজগতের কোন সন্ধান কবিরা জানেন না। চোখে দেখা কোন ভূস্বামীর চরিত্র ও জীবনযাত্রার চিত্রই তারা জমিদার দেওয়ান সওদাগর সবার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন হয়তো। আসলে অভিজাত শ্রেণীর সাথে রচয়িতাদের ছিল সীমাহীন পার্থক্য, তাই অভিজাততন্ত্রের জীবনধারা তাদের কাছে ততটা সুস্পষ্ট ছিল না। বরং সাধারণ চরিত্রগুলো এবং তাদের জীবনাচরণ অনেক বেশি প্রত্যক্ষ এবং অধিকতর সহজবোধ্য ছিল। এজন্য সাধারণ মানুষের জীবন ও চরিত্রায়ণে তারা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন এবং

স্বভাবতঃই তা জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাদের বর্ণনায়। অভিজাত শ্রেণীর চরিত্রায়ণ ও জীবনধারা বর্ণানায় এ-স্বাচ্ছন্দ্য ধরা পড়ে না।

অবশ্য প্রতিটি চরিত্রই স্ব স্ব শ্রেণীর প্রতিনিধিস্বরূপ। জমিদার, দেওয়ান, কাজী, ব্রাহ্মণ, কৃষক, সওদাগর, সাধু-সন্ন্যাসী, মাঝি-মাল্লা, বেদে, জল্লাদ এরা সবাই স্ব স্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও জীবনাচরণে তাদের সামাজিক অবস্থানগত দিক থেকে স্বতন্ত্র। বিশেষ করে নারী চরিত্রগুলো পুরো সমাজেরই প্রতিনিধিত্ব করছে। মা স্ত্রী-প্রণয়িনী থেকে শুরু করে ভাবী, বোন, সতীন, সৎমা সব ধরনের চরিত্রই রয়েছে ভিন্ন অবস্থা ও পরিবেশের প্রেক্ষিতে। এরা তাই কোন কোন ক্ষেত্রে অভিন্ন হলেও প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে চিত্রিত। নিজস্ব ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল।

আর একটি ব্যাপার লক্ষণীয় যে, মধ্যযুগের সমাজজীবনে সামাজিক যে শ্রেণীকরণ ছিল তাতে সমাজে নারীর অবস্থান ছিল অনেকটা পণ্যের মতোই। নারী বিভিন্নভাবে পুরুষের হাতের খেলার পুতুল মাত্র। নারীকে বহুমূল্য পোশাক, অলংকার, ঐশ্বর্যময় জীবন এসবের প্রলোভন দিয়ে জয় করে নেবার প্রচেষ্টা চলে, সোনা দিয়ে মুড়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। হোক না সে অন্যের স্ত্রী বা প্রণয়িনী। পুরুষের লালসাতুর আকাঙক্ষাই এখানে বড়। নারী তাদের সে লালসাতুর ইচ্ছাকে চরিতার্থ করে না বলেই পদে পদে বিপদ, ষড়যন্ত্র, নির্যাতন ও লাঞ্ছনার শিকার হতে হয় তাকে। যদিও এখানে প্রায় প্রতিটি নারীই পরিণত বয়সের, তারা স্বাধীন ও মুক্ত জীবনাকাঙক্ষায় বিশ্বাসী, প্রণয় বাসনা ও পরিণয়ে স্বাধীন মতামত প্রকাশ করছে—কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, নারীর চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল। বরং হাজারো বাধা বিপত্তি, রক্তচক্ষুর শাসনে ও নিষ্ঠুরতায়, নির্যাতনে নিপীড়নে নারীর জীবন হয়ে উঠেছে দুর্বিষহ, বেদনাময়। নারীর জীবনের সেই বেদনার করুণ কাহিনীই ঠাঁই পেয়েছে এ পালাগুলোতে। মহুয়া, মলুয়া, লীলা, মদিনা প্রত্যেকেই অতৃপ্ত জীবনে অকালে ঝরে যাবার প্রতিবাদ জানিয়ে গেছে সমাজ ও তার মানুষের বিরুদ্ধে। সে প্রতিবাদের রূপ ভিন্ন। কেউ করেছে সরবে ক্রমাগত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, কেউ করেছে নীরবে ত্যাগ-তিতিক্ষা ধৈর্যের প্রতিমূর্তি হয়ে। অভিমানে বেছে নিয়েছে মৃত্যুর পথ। কিন্তু সবকিছুর মূলে রয়েছে জীবনের প্রতি তৃষ্ণা, বেঁচে থাকার আকাঙক্ষা, অতৃপ্ত বাসনা। তাদের এ আকাঙক্ষার গলা চেপে ধরেছে কখনও সমাজের ক্ষমতাবান মানুষ বা শাস্ত্রীয় অনুশাসন।

৩

সামগ্রিকভাবে মৈমনসিংহ গীতিকা-য় চিত্রিত জনজীবন তাদের চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙক্ষার যে ছবি এখানে মূর্ত হয়ে উঠেছে তা একান্তভাবেই পূর্ব ময়মনসিংহের গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের। বাস্তব জীবনের ধূলি কাদা-মাখা মর্ত্যের জীবনেই এদের চাওয়া-পাওয়া সীমিত। এদের জীবন-তৃষ্ণা, জীবনাকাঙক্ষা ধর্ম-চেতনা মুক্ত। আত্মবিসর্জন বা আত্মত্যাগের পেছনেও কাজ করে নি পারলৌকিক মিলনাকাঙক্ষা বা পুণ্য প্রত্যাশা। তাদের প্রণয়ে নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা ও আন্তরিকতার পেছনে কাজ করে নি পারলৌকিক ভীতি বা ধর্মীয় কোন অনুভূতি। ধর্ম এদের জীবনকে আচ্ছন্ন করে নি। মানবীয় জীবন-তৃষ্ণায় উজ্জীবিত গীতিকার প্রতিটি চরিত্র। কবিরাও ছিলেন ধর্মাচ্ছন্নতা মুক্ত। ধর্মবুদ্ধি বা পাপ-পুণ্য বোধ দ্বারা তাড়িত হয়ে তারা চরিত্রগুলো নির্মাণ করেন নি। বরং এক মানবিক চেতনায় সচেতন থেকেই তারা চরিত্র নির্মাণ করেছেন। ফলে চরিত্রগুলোর ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়েছে, ব্যক্তিত্বের জাগরণ ও স্ফুরণ সম্ভব হয়েছে, মানবীয় বৃত্তি ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য, তাদের অস্তিত্ব ও চেতনার প্রকাশ ঘটেছে গীতিকার পালায়। ব্যক্তিক-জীবন ও ব্যক্তিক-অনুভূতি সমৃদ্ধ পালাগুলোর সার্থক রূপকার গীতিকার কবিগণ। সমালোচকের মতে, 'মৈমনসিংহ গীতিকার সমাজ মঙ্গলকাব্য কিংবা বৈষ্ণব কবিতার মত স্বর্গ কিংবা বৈকুণ্ঠ কামনা করে না--মর্ত জীবনের লাভ ক্ষতির মধ্যেই ইহার জীবন-স্বপ্ন সীমায়িত।'[৪৩]

মহুয়া, মলুয়া, লীলা বা মদিনা এরা কেউই তাদের প্রেমাস্পদকে মর্তজীবনের বাইরে প্রত্যাশা করে নি। জীবনের পরপারে অন্য কোন জগতে তারা মিলনাকাঙক্ষী নয়। এখানে জীবন সম্পূর্ণ ইহলৌকিক, পারলৌকিক পুরস্কারের প্রত্যাশা তাদেরকে প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রিত করে নি। তাদের যে জীবনাগ্রহ, জীবন-তৃষ্ণা এবং জীবনাচরণ, তা একেবারেই প্রাত্যহিক এবং ইহলৌকিক গীতিকার পালার চরিত্রগুলো তাই অত্যন্ত মানবিক এবং এ-কারণেই পালাগুলোর আবেদন সার্বজনীন। আর এ-কৃতিত্বের দাবীদার গীতিকার কবিগণ। তাদের অসাধারণ পর্যবেক্ষণশক্তি, গভীর জীবনদৃষ্টি, জীবনবোধ ও জীবনোপলব্ধিজাত মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে সৃষ্ট চরিত্র নিয়েই গড়ে উঠেছে *মৈমনসিংহ গীতিকা-র* জনজীবন।

তথ্যনির্দেশ

১ *'ময়মনসিংহ গীতিকা'*, সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, ভারতী বুক ষ্টল, কলিকাতা-৯, পৃ ১

২ *ময়মনসিংহ-গীতিকা*, অধ্যাপক আলি নওয়াজ, সিটি লাইব্রেরী, ঢাকা-১, প্রথম প্রকাশ : ২১ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯ ইং, পৃ ২২-২৬

৩ *মোমেনশাহীর লোক সাহিত্য*, রওশন ইজদানী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফাল্গুন ১৩৬৪, পৃ ৫৭

৪ *ময়মনসিংহ-গীতিকা*, আলি নওয়াজ, 'ময়মনসিংহের সাহিত্য ও; সংস্কৃতি,' জেলা বোর্ড, ময়মনসিংহ, প্রথম প্রকাশ : মার্চ ১৯৭৮, পৃ ৫৩-৫৬

৫ *ময়মনসিংহ*, গোলাম সামদানী কোরায়শী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৮

৬ প্রাগুক্ত, পৃ ২৯

৭ *মৈমনসিংহ-গীতিকা*, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, চতুর্থ সংস্করণ : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৩, ভূমিকা অংশ, পৃ ১।৯০

৮ *'বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা'* প্রথম খণ্ড, গোপাল হালদার, বাংলাদেশে প্রথম প্রকাশ : ১৫ই এপ্রিল ১৯৭৪, দ্বিতীয় প্রকাশ : আগষ্ট ১৯৮০, মুক্তধারা, ঢাকা-১, পৃ ২১৯

৯ প্রগুক্ত

১০ *'বাংলার লোক সাহিত্য'* প্রথম খণ্ড আশুতোষ ভট্টাচার্য, প্রথম সংস্করণ: ১৯৫৪, তৃতীয় সংস্করণ: ১৯৬২, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলিকাতা-১২, পৃ ৩৭১

১১ *'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য,'* প্রথম খণ্ড, আহমদ শরীফ, প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১৩৮৫, ডিসেম্বর ১৯৭৮, বর্ণমিছিল, ঢাকা-১। গ্রন্থটির শেষে সংযুক্ত পরিশিষ্ট-ক অংশের 'ছকে মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের খসড়াচিত্র' দ্রষ্টব্য।

১২ *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা*, প্রথম খণ্ড, ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণ ১৯৭০, ফার্মা, কে, এল মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা-১২, পৃ ১

১৩ *ময়মনসিংহ গীতিকা*, আলি নওয়াজ, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৭

১৪ '*নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা*', সাধনকুমার ভট্টাচার্য, প্রথম প্রকাশ : মে ১৯৬৩, দ্বিতীয় প্রকাশ: অক্টোবর ১৯৭৮, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৯, পৃ ১২

১৫ '*বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা*', শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ: ১৯৫৯, তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ: ১৯৬৭, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা-১২, পৃ ১৫৮

১৬ *মৈমনসিংহ-গীতিকা*, দীনেশচন্দ্র সেন, প্রাগুক্ত, পৃ ৯০

১৭ *বাংলার লোক সাহিত্য*, আশুতোষ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৯৫

১৮ *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, আহমদ শরীফ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ১০২১

১৯ *মৈমনসিংহ-গীতিকা*, দীনেশচন্দ্র সেন, প্রাগুক্ত, উক্ত সংস্করণের পালা ও পালাভুক্ত চরণ আলোচ্য প্রবন্ধে গ্রহণ করা হবে।

২০ *মৈমনসিংহ গীতিকা*, দীনেশচন্দ্র সেন, প্রাগুক্ত, মলুয়া, পৃ ৯৮

২১ প্রাগুক্ত, *দেওয়ানা মদিনা*, পৃ ৩৮৬

২২ প্রাগুক্ত, পৃ ৩৮৭

২৩ *মৈমনসিংহ-গীতিকা*, শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, প্রাগুক্ত, ভূমিকাংশ দ্রষ্টব্য।

২৪ *ময়মনসিংহ গীতিকা*, আলি নওয়াজ, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৬

২৫ *মৈমনসিংহ-গীতিকা*, শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, প্রাগুক্ত, *কঙ্ক ও লীলা*, পৃ ২৮৫

২৬ *বাংলার লোক সাহিত্য*, আশুতোষ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ ৪২৫

২৭ *মৈমনসিংহ-গীতিকা*, শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, প্রাগুক্ত, *দেওয়ানা মদিনা*, পৃ ৩৭৫

২৮ *প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্যজিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন*, ক্ষেত্র গুপ্ত, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৬, পৃ ১৬৩

২৯ *বাংলার লোক সাহিত্য*, আশুতোষ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ ৪২৩

৩০ *মৈমনসিংহ-গীতিকা*, শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, প্রাগুক্ত, পৃ ১

৩১ প্রাগুক্ত, *মহুয়া*, পৃ ১১

৩২ *প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্য-জিজ্ঞাসা ও নব-মূল্যায়ন*, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৯

৩৩ *মৈমনসিংহ-গীতিকা*, শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, প্রাগুক্ত, *মহুয়া*, পৃ ৪০

৩৪ প্রাগুক্ত, ভূমিকাংশ, পৃ ।।০

৩৫ *ময়মনসিংহ গীতিকা*, সুখময় মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ ।।√০

৩৬ *মৈমনসিংহ-গীতিকা*, শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, প্রাগুক্ত, *মলুয়া*, পৃ ৯৭

৩৭ প্রাগুক্ত, পৃ ৯৯

৩৮ প্রাগুক্ত , *মহুয়া*, পৃ ১৪

৩৯ *মোমেনশাহীর লোক সাহিত্য*, রওশন ইজদানী, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৭

৪০ *মৈমনসিংহ-গীতিকা*, দীনেশচন্দ্র সেন, প্রাগুক্ত, *মহুয়া*, পৃ. ২৪১

৪১ *বাংলার লোক সাহিত্য*, আশুতোষ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ ৪০৫

৪২ লোক সাহিত্য, দ্বিতীয় খণ্ড, আশরাফ সিদ্দিকী, মুক্তধারা, ঢাকা, পৃ ৮৩

৪৩ *বাংলার লোক সাহিত্য*, আশুতোষ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ ৪২৯